গৌরাঙ্গ গোপাল সেনগুপ্ত

প্রাচীন ভারতের পথ-পরিচয়

ভূমিকা

ডঃ রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায়—এম.এ., পি.আর.এস.,
পি.-এইচ.ডি., ডি লিট., এফ.এ.এস্.বি., ইতিহাস-শিরোমণি, পদ্মভূষণ।



ফার্মা কেএলএম (প্রাঃ) লিমিটেড,
কলিকাতা :: ১৯৭৬

প্রকাশক :
ফার্মা কেএলএম (প্রাঃ) লিমিটেড,
২৫৭-বি, বিপিন বিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট
কলিকাতা-৭০০০১২

প্রথম প্রকাশ—১৯৬০
পরিবর্দ্ধিত সংস্করণ—১৯৭৬

মূল্য—১২·০০

মুদ্রক :
এ. টি. দাস
রূপশ্রী প্রেস
১৮, কৈলাস বোস স্ট্রীট
কলিকাতা-৬

॥ ভারতসরকারপ্রদত্ত স্বল্পমূল্যের কাগজে মুদ্রিত ॥

উৎসর্গ

পরমারাধ্য পিতা স্বর্গত মতিলাল সেনগুপ্ত
ও পরমারাধ্যা মাতা স্বর্গতা বিন্দুবাসিনী দেবীর
স্মৃতির উদ্দেশ্যে

সূচীপত্র

ভূমিকা

(প্রথম সংস্করণ হইতে উদ্ধৃত)

বলা বাহুল্য সভ্যতার সূচনা ও বিকাশ মৌলিক ভৌগোলিক অবস্থা ও ব্যবস্থার উপর নির্ভর করে। সভ্যতার ভিত্তি হইতেছে সামাজিক জীবন। মানুষ সামাজিক জীব, কিন্তু প্রথমে মানুষ নিম্নশ্রেণীর প্রাণীর মতই জীবনযাত্রা নির্বাহ করিত। শিকারলব্ধ প্রাণীর উপর প্রধানতঃ তাহার জীবনযাত্রা নির্ভর করিত। ইহার পরের স্তরে অগ্নির আবিষ্কার করিয়া মানুষ আহার্যবস্তুকে রন্ধন করিয়া খাদ্যে পরিণত করিতে শিখিল। এইভাবে খাদ্য প্রস্তুত করাতে তাহার অবকাশ মিলিল। এই অবকাশ সভ্যতার মূল।

অবকাশ মানসিক শক্তি প্রয়োগের সুযোগ আনয়ন করে। এই শক্তিই সভ্যতার সৃজনীশক্তি। মানুষ বিশ্রাম পাইয়া একদিন আবিষ্কার করিল যে, কতকগুলি বীজ জমির উপর ছড়াইয়া দিলে শস্য উৎপন্ন হয়। এইরূপে কৃষি হইল সভ্যতার পরবর্তী পর্যায়। এই অবস্থায় প্রথমেই মানুষ সামাজিক জীবন লাভ করিতে পারে নাই। পৃথক পৃথক কৃষক-পল্লীর মধ্যে পরস্পর সংযোগ ও আদান-প্রদানের উপায় তখনও উদ্ভাবিত হয় নাই। সভ্যতা বিস্তারের প্রধান উপায়—গমনাগমনের সুযোগ, পথের সৃষ্টি।

প্রাচীন ভারতের অর্থনীতি, জীবনযাত্রা, বেশভূষা, চিত্রকলা প্রভৃতি বিষয়ে আলোচনাপ্রসূত বহু গ্রন্থ ইংরাজী ও বাঙ্গলায় রচিত হইয়াছে।

প্রাচীন ভারতের পথ সম্বন্ধে বিশিষ্ট গবেষণামূলক পুস্তক এ যাবৎ বাঙ্গলা ভাষায় লিখিত হয় নাই। বর্তমান পুস্তকের লেখক দক্ষতার সহিত সেই অভাব পূরণের চেষ্টা করিয়াছেন। আলোচনা সূত্রে প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতার ক্রমিক বিবর্তনও এই পুস্তকে দেখান হইয়াছে। বিষয়টি বিস্তৃত ও জটিল, বহুস্থলে মতদ্বৈধতার জন্য চূড়ান্ত নিষ্পত্তিও কঠিন। এই প্রসঙ্গে লেখক সাধারণতঃ গৃহীত মতবাদের পথেই অগ্রসর হইয়াছেন এবং ইহা দ্বারা ভারতের প্রাচীন সভ্যতার রূপ-রেখাটি মোটামুটি ভাবে সুপরিস্ফুট হইয়াছে।

এই গ্রন্থে ইতিহাসের ক্রমানুযায়ী প্রথমেই প্রাক্‌বৈদিক যুগের পথের আলোচনা করা হইয়াছে। তাহার পর বৈদিক যুগ, রামায়ণ মহাভারতের ঘটনা-কাল ও পাণিনির সমকালীন পথের পরিচয় দেওয়া হইয়াছে। তাহার পর আছে বৌদ্ধযুগ, মৌর্যযুগ, গুপ্তযুগ, কান্যকুব্জ সাম্রাজ্যের যুগ ও

হিন্দু শাসনের শেষ অধ্যায়কালীন পথাবলীর পরিচয়। পূর্বভারত (বাঙ্গলা ও আসাম) ও দক্ষিণ ভারতের পথের কথা বিশেষভাবে পরবর্তী দুই অধ্যায়ে বিস্তৃততর ভাবে বিবৃত হইয়াছে। পরিশিষ্টে (ক) মধ্যযুগ ও বর্তমান যুগের আলোচনা করা হইয়াছে। এই পুস্তক পাঠে পাঠক প্রাক্‌বৈদিক যুগ হইতে বর্তমান যুগ পর্যন্ত ঐতিহাসিক বিবর্তনের পরিপ্রেক্ষিতে ভারতবর্ষের পথগুলির একটি ধারাবাহিক পরিচয় পাইবেন। পরিশিষ্টে (খ) প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যে পথ প্রসঙ্গ অধ্যায়ে পথসম্বন্ধীয় বহু জ্ঞাতব্য তথ্য সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। পুস্তক শেষে যে গ্রন্থ-পঞ্জী দেওয়া হইয়াছে তাহা গ্রন্থকারের বিস্তৃত অধ্যয়ন ও মানসিক সততার পরিচায়ক। ভারতেতিহাস জিজ্ঞাসুর পক্ষে এই গ্রন্থ-তালিকা বিশেষ প্রয়োজনে আসিবে।

লেখক পূর্বোত্তর রেলপথের জনসংযোগ ও প্রচার বিভাগের সাংবাদিকের পদে অধিষ্ঠিত আছেন, ব্যক্তিগত জীবনে তিনি একজন সুপরিচিত সাহিত্য-সেবক। দায়িত্বপূর্ণ সরকারী কর্মের দুর্লভ অবসরে অল্পায়াস সাধ্য লঘু রচনার প্রলোভন ত্যাগ করিয়া গভীর দেশপ্রেম ও মাতৃভাষার প্রতি আন্তরিক অনুরাগের দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া প্রাচীন ভারতের সংস্কৃতির ইতিহাসের একটি উপেক্ষিত কিন্তু আবশ্যকীয় অধ্যায় তিনি যেরূপ পরিশ্রম ও নিষ্ঠার সহিত উপস্থাপিত করিয়াছেন তাহাতে তিনি সাধারণ ভারতবাসির বিশেষভাবে বাঙ্গালী পাঠকের অশেষ কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন—ইহাই আমার বিশেষ বক্তব্য।

স্বাধীন ভারত গঠনের প্রধান উপকরণ যে জাতীয় ইতিহাসের সহিত পূর্ণ পরিচয় ও তাহার জন্য গভীর গৌরব বোধ—ইহা স্বতঃসিদ্ধ। এইদিক হইতে শ্রীসেনগুপ্তের এই পুস্তকটি বিশেষ সময়োপযোগী হইয়াছে। আশা করা যাইতে পারে যে ইহা আমাদের বিদ্যালয়গুলিতে সবিশেষ উপযোগী পাঠ্যপুস্তক হিসাবে মনোনীত হইবে।

আশাকরি ভবিষ্যতে গ্রন্থকার দেশের প্রাচীন-ইতিহাস ও সংস্কৃতি সম্বন্ধে এইরূপ আরও সুপাঠ্য গ্রন্থ রচনায় নিযুক্ত থাকিয়া মাতৃভাষাকে সমৃদ্ধ করিবেন। আমি সর্বান্তঃকরণে তাঁহার সাধনার সাফল্য কামনা করি।

৩৯, একডালিয়া রোড
কলিকাতা-১৯

শ্রীরাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায়
১২।৭।১৯৬০

লেখকের নিবেদন

প্রাচীন ভারতের পথ-পরিচয় গ্রন্থটি প্রায় ষোড়শবর্ষ পূর্বে প্রকাশিত হইয়াছিল। দীর্ঘদিন ধরিয়া ইহা দুষ্প্রাপ্য থাকায় বহু পাঠকের অনুরোধে ইহার সংশোধিত ও পরিবর্দ্ধিত সংস্করণ প্রকাশ করা হইল। সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক ডঃ শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সরকার (ভূতপূর্ব কারমাইকেল অধ্যাপক, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়), ডঃ শ্রীযুক্ত কল্যাণকুমার গঙ্গোপাধ্যায় (বাগেশ্বরী অধ্যাপক, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়) ও ডঃ শ্রীযুক্ত ব্রতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় (কারমাইকেল অধ্যাপক, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়) এই পরিবর্দ্ধিত সংস্করণ প্রস্তুত কালে আমাকে নানা সুপরামর্শ ও উপদেশ দিয়া বাধিত করিয়াছেন, তজ্জন্য ইঁহাদের প্রতি আমার গভীর কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি।

এই পুস্তক প্রকাশে ফার্মা কেএল্‌এম্ (প্রাঃ) লিমিটেড্-এর কর্ণধার শ্রীযুক্ত কানাইলাল মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত জ্যোৎস্না সিংহ রায় প্রভৃতি পরম হিতৈষী সুহৃদ্‌গণের উৎসাহ ও আনুকূল্য কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করিতেছি।

এই পুস্তকটির প্রথম সংস্করণ প্রকাশকালে ইতিহাস-শিরোমণি ডঃ রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায় মহাশয় এই অকিঞ্চন ইতিহাস-পথিকের প্রতি স্নেহবশতঃ ইহার একটি মূল্যবান ভূমিকা লিখিয়া দিয়াছিলেন। এই ভূমিকাটি বর্তমান সংস্করণেও অবিকল সন্নিবিষ্ট হইল। এই উপলক্ষ্যে এই পরলোকগত দেশপ্রেমিক ও ইতিহাস-সাধকের স্মৃতির উদ্দেশ্যে আমি আমার বিনম্র প্রণতি জ্ঞাপন করিতেছি। ইতি—

বিনীত

গৌরাঙ্গ গোপাল সেনগুপ্ত

৩রা কার্তিক, ১৩৮৩ বঙ্গাব্দ

২০শে অক্টোবর, ১৯৭৬ খ্রীঃ

১৫৮/ডি, রাসবিহারী এভেন্যু

কলিকাতা-৭০০০২৯

"তুমি জীবনের পাতায় পাতায় অদৃশ্য লিপি দিয়া
পিতামহদের কাহিনী লিখিছ মজ্জায় মিশাইয়া।
যাহাদের কথা ভুলেছে সবাই
তুমি তাহাদের কিছু ভোল নাই,
বিস্মৃত যত নীরব কাহিনী স্তম্ভিত হয়ে বও।
ভাষা দাও তারে, হে মুনি অতীত, কথা কও, কথা কও॥"

—রবীন্দ্রনাথ

প্রাচীন ভারতের মুখ্য পথাবলীর রূপরেখা

পুষ্কলাবতী
তক্ষশিলা
ব্রহ্মপুর
সিংহপুর
শাকল
জলন্ধর
বদ্রীনাথ
মূলস্থান
(হরপ্পা)
কুরুক্ষেত্র
শিরসা
হস্তিনাপুর
ইন্দ্রপ্রস্থ
অহিচ্ছত্র
রোরুক
(মহেঞ্জোদড়ো)
মথুরা
শ্রাবস্তী
কপিলবস্তু
কাম্পিল্য
সাকেত
মিথিলা
প্রাগজ্যোতিষপুর
পাতাল
কান্যকুব্জ
বৈশালী
চম্পা
আজমীর
প্রয়াগ
পাটলিপুত্র
মহাস্থান
কৌশাম্বী
কাশী
গয়া
গৌড়
পোতনা
দশপুর
বিদিশা
রাজগৃহ
কর্ণসুবর্ণ
উজ্জয়িনী
(বর্দ্ধমান)
দ্বারাবতী
বলভী
মাহিষ্মতী
তাম্রলিপ্ত
ভারুকচ্ছ
যাজপুর
তোসলী
(ভুবনেশ্বর)
সূর্পারক
প্রতিষ্ঠান
কল্যাণ
টগর
(তেগার)
দন্তপুর
কলিঙ্গপুর
পিঠাপুরী
অমরাবতী
বিজয়বতী
বেঙ্গি
কন্নানোর
(মসলিপত্তন)
তাম্রোলম
কাঞ্চী
(আরিকামাড়ু)
চিদম্বরম
তাঞ্জোর
(মুজিরিস)
মাদুরা
কারুর
রামেশ্বরম
নেলসিণ্ডা
তিরুনেলভেলি
কন্যাকুমারী
সিংহল

পথরেখা- ....

প্রথম অধ্যায়

পূর্বাভাষ—প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতার কথা

আমাদের দেশের বহু লোকের মনে এইরূপ একটি ভুল ধারণা আছে যে, প্রাচীন ভারতবর্ষের সভ্যতা বেদ, উপনিষদ, পুরাণ, স্মৃতি ও দর্শনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। প্রাচীন ভারতীয় মানুষ বা প্রাচীন-হিন্দু শুধু মস্তিষ্কের চর্চাই করিত, বৈষয়িক জীবনে তাহারা বিশেষ অগ্রসর ছিল না।

সভ্যতার আভিধানিক অর্থ অগ্রসর অথবা উন্নত সমাজ-ব্যবস্থা। এই উন্নত সমাজ-ব্যবস্থা কোন একটি বিশেষ মানব-গোষ্ঠীর মানসিক ও ব্যবহারিক উদ্যমের ফলেই জন্মলাভ করিতে পারে। শুধু বুদ্ধিবৃত্তির চর্চার দ্বারা কোন জাতি সভ্যতার শিখরে উপনীত হইতে পারে না। এই বুদ্ধিবৃত্তির চর্চাই তাহাকে বৈষয়িক উন্নতি দ্বারা জীবনে অধিকতর শারীরিক আরাম ও স্বাচ্ছন্দ্য আহরণে প্ররোচিত করে।

প্রাগৈতিহাসিক যুগে ভারতবর্ষের সভ্যতার নানা বিক্ষিপ্ত নিদর্শন এ যাবৎ পাওয়া গিয়াছে। আধুনিক কালে, বর্তমান শতাব্দীর বিংশ-ত্রিংশ দশকে সর্বাপেক্ষা প্রামাণ্য নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে অবিভক্ত ভারতের পাঞ্জাবের মণ্টোগোমারী জেলায় হরপ্পা ও সিন্ধু প্রদেশের লারকানা জেলায় মহেঞ্জোদড়ো নামক স্থান দুইটি খননের ফলে। এই সভ্যতাকে পুরাতত্ত্ববিদেরা সাধারণ ভাবে সিন্ধু সভ্যতা বলিয়া অভিহিত করেন। এই দুইটি স্থান ও সন্নিহিত অঞ্চল সিন্ধু নদীর উপত্যকায় অবস্থিত। সিন্ধু সভ্যতার যে নিদর্শন এ যাবৎ পাওয়া গিয়াছে তাহা উহার অন্তিম অবস্থার। এই নগরী দুইটি সৃষ্টির বহু পূর্বেই এই সভ্যতার জন্ম হইয়াছিল। এই নগরী দুইটির ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কারের জন্য—এই নগরী দুইটিই সিন্ধু সভ্যতার একক নিদর্শন ইহা বলা চলে না। এই অঞ্চলে পরবর্তী কালে প্রায় ষাটটি প্রত্নসমৃদ্ধ স্থান আবিষ্কৃত হইয়াছে। আরও পরবর্তী কালে উৎখননের ফলে জানা গিয়াছে যে এই সভ্যতা হরপ্পা হইতে পূর্ব দিকে সিমলা শৈলের পাদমূলে রূপার (পাঞ্জাব) ও রাজস্থানের বিকানীরের নিকট কালিবঙ্গান পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। রাজস্থানের দক্ষিণে নর্মদা নদীর উত্তরভাগে অবস্থিত সৌরাষ্ট্রের লোথাল অঞ্চলেও এই সভ্যতার নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে। ভারতের স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর ভারতের পশ্চিমাঞ্চল ও

পাকিস্তানের সিন্ধু ও বালুচিস্তান প্রদেশে তাম্রাশ্মীয় (chalcolithic) যুগের যে নিদর্শনগুলি উভয় দেশের প্রত্নতাত্ত্বিকগণ আবিষ্কার করিয়াছেন তাহাতে মনে হয় এই সভ্যতার ব্যাপ্তি সম্বন্ধে শেষ কথা বলার সময় এখনও আসে নাই। নব নব উৎখননের ফলে এ বিষয়ে ভবিষ্যতে বহু তথ্য উদ্ঘাটিত হইবার সম্ভাবনা আছে।

মহেঞ্জোদড়ো ও হরপ্পার ধ্বংসস্তূপ হইতে বুঝা যায় যে নগরী দুইটি বিশেষ পরিকল্পনা সহকারে নির্মিত হইয়াছিল। ধনী ব্যক্তিদের অথবা সরকারী কার্য পরিচালনার্থ বহু কক্ষযুক্ত সুবৃহৎ অট্টালিকা, মধ্যবিত্তদের জন্য দুই কক্ষযুক্ত গৃহ, বড় বড় শস্যাগার, অতি সুপ্রশস্ত রাজপথ, সর্বসাধারণের ব্যবহার্থ অতি বিরাট স্নানাগার, বিস্তৃত দেবায়তন ইত্যাদি নগরী দুইটির বৈশিষ্ট্য। পথঘাট আলোকিত রাখিবার ও বাসগৃহগুলির ও শহরের ময়লা জল নিকাশের জন্য ভূগর্ভস্থ পয়ঃপ্রণালীর ব্যবস্থা ছিল। এই সমস্ত পয়ঃপ্রণালী নিয়মিতরূপে পরিষ্কৃত রাখারও ব্যবস্থা লক্ষ্যণীয়। শহরের সমস্ত আবর্জনারাশি শহর হইতে দূরে একটি খাদের মধ্যে প্রোথিত করা হইত। নগর পরিকল্পনায় জনসাধারণের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের দিকে নগরপালক বা রাষ্ট্রনিয়ন্তাদের যে পূর্ণ লক্ষ্য ছিল ইহা বেশ বুঝা যায়।

ধ্বংসস্তূপ হইতে প্রাপ্ত বস্তুগুলি হইতে সেখানকার অধিবাসীদের জীবনযাত্রা প্রণালীর একটা আভাস পাওয়া যায়। এখানকার অধিবাসীরা গম, যব ও ধান্যের চাষ করিত। ইহা ব্যতীত দুধ, শাক-সব্জি, ফল, মেষ, ছাগ, শূকর ও গবাদি পশুর মাংস, কুক্কুটাদি নানাবিধ পক্ষী ও কচ্ছপের মাংস ইহাদের খাদ্য ছিল। বৃষ, মহিষ, মেষ, শূকর, কুক্কুর, অশ্ব ও হস্তী গৃহপালিত পশু হিসাবে প্রতিপালিত হইত। তুলা ও পশমের বস্ত্র বয়ন ও ব্যবহার প্রচলিত ছিল। স্বর্ণ, রৌপ্য, তাম্র, পিতল ও সীসক ধাতু হিসাবে ব্যবহৃত হইত। ছোটবড় নানা আকারের ওজনও ধ্বংসস্তূপের মধ্য হইতে পাওয়া গিয়াছে। সিন্ধুসভ্যতার অধিবাসীরা ব্যবসায় বাণিজ্যে পারদর্শী ছিল। ভারতের নানাস্থান হইতে বাণিজ্য দ্রব্য আহরিত হইত। এতদ্ব্যতীত সিন্ধু সভ্যতার অধিবাসীদের সহিত প্রাচীন সুমের, ঈজিপ্ট, ক্রীট্ এবং মধ্য ও পশ্চিম এশিয়ার দেশগুলির সহিত বাণিজ্যিক সম্পর্কের সুস্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। এই সম্বন্ধে পরে বিশদ আলোচনা করা হইবে।

সার জন মার্শালের মতে সিন্ধু সভ্যতার স্থিতিকাল খৃষ্টপূর্ব ৩২৫০ হইতে ২৭৫০ খৃঃ পূঃ অব্দ। আর্নেস্ট ম্যাকের মতে খৃষ্টপূর্ব ৩০৫০ হইতে ২৫৫০ খৃঃ পূঃ

অব্দ সিন্ধু সভ্যতার কাল। হুইলারের মতে খৃঃ পূঃ ২৫০০ হইতে ১৫০০ শতাব্দী সিন্ধু সভ্যতার স্থিতিকাল (১)। ভারতীয় ঐতিহাসিকদের বিশ্বাস এই যে—খৃঃ পূঃ ২৮০০ হইতে ২২০০ অব্দ পর্যন্ত এই সভ্যতার যৌবনকাল। এই সময় সীমার পূর্বেও পরে ও ইহা বিদ্যমান ছিল (২)। সিন্ধু সভ্যতাকে যদি ভারতের আদিমতম সভ্যতার নিদর্শন বলিয়া ধরা যায় তবে ভারতীয় সভ্যতা পাঁচ সহস্র বৎসরেরও অধিক প্রাচীন, ইহা স্বীকার করিয়া লইতে হইবে। সিন্ধুসভ্যতা আবিষ্কারের কালে মনে করা হইত যে, উহা সুমেরীয় বা অন্যান্য সভ্যতার সমসাময়িক। ব্যাপকতর গবেষণায় ক্রমশঃ প্রমাণিত হইতেছে যে উহা পৃথিবীর আদিমতম সভ্যতা। সম্ভবতঃ পৃথিবীর এই অংশেই প্রথম কৃষিকর্মের উদ্ভব হইয়াছিল। কৃষি ও কৃষিজ খাদ্যই সভ্যতার অন্যতম ধারক ও বাহক।

২

সিন্ধু সভ্যতার পরে আমরা ভারতবর্ষে বৈদিক সভ্যতার বিস্তার দেখিতে পাই। বৈদিক সভ্যতার প্রথম পর্যায় খৃঃ পূঃ ২৫০০ হইতে ১০০০ খৃঃ পূঃ অব্দ পর্যন্ত ধরা যাইতে পারে। দ্বিতীয় পর্যায় খৃঃ পূঃ ১০০০ হইতে খৃঃ পূঃ ৫০০ অব্দ। আদিম বৈদিক সভ্যতার রূপ-রেখা ভারতীয় আর্যদের রচিত ঋগ্বেদে প্রতিফলিত হইয়াছে। উইন্ট্যারনিৎজ প্রভৃতি পণ্ডিতদের মতে খৃঃ পূঃ ২৫০০ এর নিকটবর্তী সময়ে ঋগ্বেদের মন্ত্রগুলির রচনা আরম্ভ হয়। কেহ কেহ ঋগ্বেদ আরও পূর্ববর্তী কালের রচনা বলিয়া মনে করেন। কীথ ও ম্যাক্সমূল্যরের মতে ঋগ্বেদ রচনার কাল ১২০০ খৃঃ পূঃ। ঋগ্বেদের যে রূপ আমরা বর্তমানে দেখিতে পাই উহা আনুমানিক একাদশ খৃঃ পূঃ কৃষ্ণ-দ্বৈপায়ন বেদব্যাস দ্বারা প্রদত্ত। বেদ সঙ্কলন কালে বেদব্যাস নিঃসন্দেহে সমকালীন ভাষা ব্যবহার করেন। উইন্ট্যারনিৎজ, য়াকোবি প্রভৃতি পণ্ডিতেরা এই কথা মনে করিয়াই বেদ রচনার কাল নির্ণয় করেন। অপর পক্ষে কীথ, ম্যাক্সমূল্যর প্রভৃতি পণ্ডিতেরা বেদব্যাস সঙ্কলিত ঋগ্বেদের ভাষার ভিত্তিতেই ইহার রচনাকাল স্থির করেন—ইহাই উভয় পক্ষের মধ্যে মতপার্থক্যের কারণ। সাধারণতঃ বর্তমানে পণ্ডিতেরা এই

(১) R. E. M. Wheeler—Indus Valley Civilization (Cambridge History of India Suppl. Vol) P. 93.

(২) R. C. Majumdar (Ed,) Hist. and Culture of the Indian People Vol I, 2nd edn., P. 192 (1952).

ধারণা পোষণ করিয়া থাকেন যে বৈদিক আর্যেরা তাঁহাদের সমগোত্রীয়দের সহিত (১) উত্তর ইউরোপ, (২) রাশিয়ার দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চল (৩) বর্তমান ইউরোপের অষ্ট্রীয়া, হাঙ্গেরী, বোহেমিয়া (৪) পামীর এবং (৫) উত্তরমেরু— ইহার মধ্যে কোন একস্থানে বাস করিতেন। জীবিকার অন্বেষণে তাঁহারা এক এক বিভিন্ন অঞ্চলে চলিয়া যান। ভারতীয় আর্যদের পূর্বপুরুষেরা সর্বশেষে ডানিয়ুব উপত্যকা, এসিয়া মাইনর, পারস্য, হীরাট ও ব্যাক্‌ট্রিয়া হইয়া ভারতে প্রবেশ করেন। পারসীক, গ্রীক্, লাটিন, টিউটনিক, কেল্ট, স্লাভোনিক ও সংস্কৃতের ভাষাগত ঐক্য আর্যজাতি সমূহের রক্ত সম্বন্ধের অভ্রান্ত প্রমাণ বহন করিতেছে।

ঋগ্বেদ রচনার কালে আর্যেরা যে ভারতবর্ষে স্থায়ী হইয়াছিলেন ইহার প্রমাণ পাওয়া যায়। ঋগ্বেদে যে সভ্যতার রূপ প্রতিফলিত হইয়াছে উহা নিঃসন্দেহে ভারতের মৃত্তিকায় উদ্ভূত ও বিকাশপ্রাপ্ত সভ্যতা। ঋগ্বেদ রচনার কাল ভারতীয় আর্য সভ্যতার যৌবনকাল—এই সময়ে আর্য সমাজ-ব্যবস্থা একটি সংহত ও সুগঠিত রূপ প্রাপ্ত হইয়াছিল। ঋগ্বেদে ভারতের আর্যেতর বা অনার্যদের দাস, দস্যু বা অসুর আখ্যা দেওয়া হইয়াছে। আর্য-অনার্য সঙ্ঘর্ষের নানা বিবরণ ঋগ্বেদে পাওয়া যায়। ঋগ্বেদের একটি প্রার্থনায় বলা হইয়াছে—"আমরা চতুর্দিকে দস্যু কর্তৃক পরিবেষ্টিত, ইহারা যজ্ঞ করে না, ইহাদের রীতি নীতি ভিন্ন। তুমি ইহাদের ধ্বংস কর।" ঋগ্বেদে বর্ণিত দাস, দস্যু বা অসুরেরা যে সিন্ধুসভ্যতার উত্তরাধিকারী ছিল না ইহার বিপক্ষে কোন প্রমাণ নাই। ঋগ্বেদে দস্যুদের দ্বারা অধ্যুষিত 'শতভুজী' 'অশ্মময়ী' 'আয়সী' নগর, দুর্গ প্রভৃতির যে বিবরণ আছে সিন্ধুসভ্যতার কালের নগর দুর্গাদির বিবরণের সহিত তাহার বিস্ময়জনক সাদৃশ্য দেখা যায়। সিন্ধুসভ্যতার অন্তিম অবস্থার কাল ও ঋগ্বেদ রচনার কাল প্রায় এক। ঋগ্বেদে ইন্দ্রের পুরন্দর অর্থাৎ নগর বা দুর্গ চূর্ণকারী আখ্যা আছে। সম্ভবতঃ আর্য নায়ক ইন্দ্র (উত্তরকালে দেবতা বলিয়া পরিগণিত) অসুর, রাক্ষস, দাস বা দস্যু নামে অভিহিত সিন্ধুসভ্যতার উত্তরাধিকারী ও অন্যান্য আদিবাসীদের সহিত যুদ্ধ করিয়া এই সব নগর ধ্বংস করেন। অধ্যাপক মার্টিমার হুইলার হরপ্পা ধ্বংসের জন্য আর্য নায়ক ইন্দ্রকেই দায়ী করিয়াছেন (১)। অধ্যাপক স্টুয়ার্ট পিগটও এই মতের সমর্থক (২)।

---

(১) R. E. M. Wheeler, Ancient India No. 3 (1947), P. 82
(২) Stuart Piggot, Pre-Historic India. London, 1952, P. 262-3.

নবাগত আর্যদের সহিত সিন্ধুসভ্যতার উত্তরাধিকারিগণের সংঘর্ষের বিষয়টি স্বীকার করিয়া লইলেও অনেক ভারতীয় ঐতিহাসিক আর্যগণকে এই সভ্যতার উচ্ছেদের জন্য দায়ী বলিয়া মনে করেন না, কারণ আর্যগণ কর্তৃক সিন্ধুসভ্যতার নিদর্শনগুলি ধ্বংস করার পক্ষে পর্যাপ্ত প্রত্নতাত্ত্বিক সাক্ষ্য এ যাবৎ পাওয়া যায় নাই। তাঁহাদের বিশ্বাস প্রাকৃতিক দুর্যোগেই হরপ্পা ও মহেঞ্জোদড়ো প্রভৃতি নগরীগুলি বিনষ্ট হইয়া যাওয়াতে ইহার অধিবাসিগণ চতুর্দিকে উপযুক্ত বাসস্থানের অন্বেষণে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। সংঘাতের দৃষ্টান্ত সত্ত্বেও ঋগ্বেদের সাক্ষ্য হইতে ইহাই প্রমাণিত হয়, যে আর্য ও অনার্যেরা খৃঃ পূঃ ১৫০০ অব্দের পূর্বেই সহাবস্থানে অভ্যস্ত হইয়া উঠিয়াছিল।

আর্যেতর সভ্যতা বৈদিক আর্য সভ্যতাকে নানাভাবে প্রভাবিত করিয়াছিল। পরাজিত অনার্যেরা বন্য বর্বর ছিল না। পরিণত সভ্যতার উত্তরাধিকারী এই মানবগোষ্ঠীকে বৈদিক আর্যেরা নিশ্চিহ্ন করিয়া দিতে পারে নাই। এই গোষ্ঠী ধীরে ধীরে নিজেদের সভ্যতা ও ধ্যান-ধারণার বিচিত্র উপচার লইয়া বিজেতাদের সমাজে অনুপ্রবিষ্ট হয়।

অন্যভাবে বলিলে বলিতে পারা যায়, বিজেতা আর্যগণ কর্তৃক আত্মীকরণের ফলে অনার্য, অসুর বা দস্যুদের পৃথক সত্তা লুপ্ত হইয়া যায়। বৈদিক যুগের উষাকাল হইতে এই আত্মীকরণের কাজ ধীরে ধীরে হয়ত বিজেতা আর্যদের অজ্ঞাতসারেই ঘটিতে থাকে। বর্তমানে হিন্দু-সভ্যতা বলিতে আমরা যাহা বুঝি তাহা ভারতের আর্য-অনার্য উভয়ের দানেই সমৃদ্ধ। এই সভ্যতা সিন্ধু সভ্যতার কাল অর্থাৎ পাঁচ সহস্র বৎসর পূর্বেরও অধিককাল হইতে পরম্পরাগত। আর্য অনার্য সংঘর্ষে ভারতীয় প্রাগৈতিহাসিক সভ্যতার ধারা বিচ্ছিন্ন হয় নাই। ভারতভূমির প্রাক্-বৈদিক সভ্যতা আর্যদের উন্নততর চিন্তাধারায় পরিপুষ্টতা লাভ করিয়া সুচিরকালজয়ী বিরাট এক সভ্যতার লক্ষ্যের অভিমুখে প্রবহমান হয়।

সিন্ধু সভ্যতার সমসাময়িক ও পরবর্তী-কালে উদ্ভূত সভ্যতা ও উহাদের জন্মদাতা জাতিগুলি আজ বিস্মৃতির অতল গহ্বরে নিমজ্জিত। পতন-অভ্যুদয়-বন্ধুর পন্থায় যুগযুগধাবিত যাত্রীর দল ভারতভাগ্যবিধাতার চিরসারথিত্বে ভারতবর্ষের এই সুপ্রাচীন সভ্যতাকে আজিও সঞ্জীবিত রাখিয়াছে। ভারতবর্ষের সভ্যতা প্রাচীনতম কিনা এ বিষয়ে হয়ত তর্কের অবকাশ আছে. কিন্তু

ভারতের সভ্যতা যে জগতের অন্যতম প্রাচীনতম জীবন্ত সভ্যতা এ বিষয়ে তর্কের কোন অবকাশ নাই।

৩

সিন্ধুসভ্যতার সহিত বৈদিক সভ্যতার পারম্পর্য আলোচনার পর ঋগ্বেদের পটভূমিকায় বৈদিক-সভ্যতার সম্বন্ধে সাধারণ আলোচনা প্রয়োজন। এই আলোচনা বৈষয়িক সভ্যতার মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখা হইবে। বৈদিক আর্যেরা গো-পালন করিতেন। গো-শকটে বলীবর্দ ব্যবহৃত হইত। গমনাগমনের জন্য রথ ও উহা টানিবার জন্য অশ্ব ব্যবহৃত হইত। গো-পালন ব্যতীত আর্যেরা কৃষিকর্মেও মনোযোগী ছিলেন। ছয়, আট অথবা বারটি বলীবর্দ জমি-চাষের কাজে ব্যবহৃত হইত। কৃষিক্ষেত্রের সন্নিকটে কূপ খনন করিয়া জমিতে জল সেচ করা হইত। সম্ভবস্থলে, হ্রদ অথবা খাল হইতেও সেচের জন্য জল আহরিত হইত। কৃষিকর্ম দ্বারা ধান্য, যব, তিল গোধুম, ভুট্টা প্রভৃতি উৎপন্ন হইত। আর্যেরা গৃহ নির্মাণ করিতে জানিতেন, তাঁহাদেরও নগর দুর্গাদি ছিল, হয়ত বিজিত সিন্ধু সভ্যতার উত্তরাধিকারিগণের নিকট হইতে তাঁহারা বাস্তুনির্মাণ বিদ্যা আয়ত্ত করিয়াছিলেন। ছুতারেরা যুদ্ধ অথবা মৃগয়ার জন্য রথ, শকট প্রভৃতি প্রস্তুত ব্যতীত নানারূপ কাঠ খোদাইয়ের ও কাজ করিত। কর্মকার বা কামারেরা লৌহ গলাইয়া নানারূপ পাত্র, অস্ত্রশস্ত্র প্রভৃতি প্রস্তুত করিত। স্বর্ণকার নদীগর্ভ ও ভূমধ্যস্থ স্বর্ণ আহরণ করিয়া নানারূপ অলঙ্কার নির্মাণ করিত। চর্মকার চর্মদ্বারা ধনুকের ছিলা, অশ্বের বল্গা ও রথে ব্যবহার্য চামড়ার সরঞ্জাম প্রভৃতি প্রস্তুত করিত। তন্তুবায়ের কাজ ছিল বস্ত্র বয়ন। ঋগ্বেদে বণিকের উল্লেখ আছে। সাধারণতঃ বিনিময় প্রথাতেই ক্রয় বিক্রয় নিষ্পন্ন হইত। এই যুগে ব্যবসায়-বাণিজ্যের কথা যথাস্থলে আলোচিত হইবে।

দুগ্ধ ও দুগ্ধজাত মাখন, দধি, চাউল ও যব হইতে প্রস্তুত পিষ্টক, পায়স ও যজ্ঞে বলিপ্রদত্ত পশুমাংস খাদ্য হিসাবে ব্যবহৃত হইত। কয়েকটি ব্যক্তি লইয়া একটি পরিবার, কয়েকটি গ্রাম লইয়া কুল, কয়েকটি কুল লইয়া জন ও কয়েকটি জন লইয়া ছিল রাষ্ট্র। ঋগ্বেদের যুগে রাজতন্ত্র বর্তমান ছিল। রাজা অমাত্যদের সহায়তায় রাজকার্য পরিচালন করিতেন। ঋগ্বেদে সভা ও সমিতির উল্লেখ আছে। সভাগুলি ছিল বিশিষ্ট ও অভিজাত ব্যক্তিদের পরিষদ (Councils

of elders or nobles)। সমিতিগুলি সম্ভবতঃ সাধারণ জন-প্রতিনিধি লইয়া গঠিত হইত (people's assembly)। দেশের কল্যাণের নিমিত্ত সমিতির সহিত রাজার মতৈক্যের প্রয়োজনীয়তা ঋগ্বেদে উল্লিখিত হইয়াছে (১)।

ঋগ্বেদের কাল হইতে আর্যসভ্যতা ক্রমশঃ পূর্বদিকে বিস্তারলাভ করিতে থাকে। ঋগ্বেদের পরবর্তীকালে রচিত সংহিতা, ব্রাহ্মণ, আরণ্যক ও উপনিষদে এই প্রসারের পরিচয় আছে। এই সব পুস্তকে কুরু, পাঞ্চাল, কোশল, বিদেহ, মগধ প্রভৃতি নূতন নূতন রাষ্ট্রের উল্লেখ দেখা যায়। কৃষি-ব্যবস্থা উন্নততর হয়, ক্ষৌরকার, রজক, স্থপতি প্রভৃতি নূতন নূতন বৃত্তিরও সৃষ্টি হয়। শতপথ ব্রাহ্মণে বাণিজ্যের উল্লেখ আছে। ঐতরেয় ব্রাহ্মণ ও বৃহদারণ্যক উপনিষদে শ্রেষ্ঠী শব্দ উল্লিখিত হইয়াছে। এই সময়ে আর্যজাতি সম্পূর্ণ কৃষি নির্ভরতা ত্যাগ করিয়া ব্যবসা বাণিজ্যেও লিপ্ত হয়। এই যুগে নূতন নূতন দেবতার উল্লেখ আছে, ইহাদের অনেকগুলি সিন্ধু সভ্যতার উত্তরাধিকারী তথাকথিত অনার্যদের পরিকল্পিত ও পূজিত দেবতা।

বৈদিক সভ্যতার পরবর্তীকালে সূত্র, পুরাণ ও স্মৃতিগ্রন্থগুলি রচিত হয়। মানব মনীষার অন্যতম শ্রেষ্ঠ নিদর্শন পাণিনির অষ্টাধ্যায়ী (ব্যাকরণ) এই সময়ে রচিত।

পাণিনির যুগে আর্যসভ্যতার সীমা পূর্বে কলিঙ্গ হইতে পশ্চিমে সিন্ধুদেশ পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। প্রাচীন হিন্দুর অর্থনৈতিক জীবন এই সময়ে নানাভাবে প্রসারিত হইয়াছিল। পাণিনির ব্যাকরণে ব্যবসায় ও বাণিজ্য উভয়েরই উল্লেখ দেখা যায়। পাণিনির ব্যাকরণ, শ্রৌত, গৃহ্য ও ধর্মসূত্র এবং রামায়ণ, মহাভারত ও স্মৃতিশাস্ত্রগুলি এই সময়ের সুসংহত-উন্নত সমাজ ব্যবস্থার পরিচায়ক।

৪

তিনদিকে সমুদ্র ও উত্তরে পূর্ব-পশ্চিমে বিস্তৃত নগাধিরাজ হিমালয়ের অবস্থিতি স্বভাবতঃই ভারতবর্ষকে একটি অখণ্ড দেশের রূপদান করিয়াছে। স্মরণাতীতকাল হইতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাষ্ট্রে বিভক্ত ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের

(১) Dr. Radha Kumud Mookerji Hindu Civilization (Part-I) (Bhavan's Edn.), Bombay 1957, P. 128

অধিবাসিগণ ভারতবর্ষের এই অন্তর্নিহিত অখণ্ডতা সম্বন্ধে সচেতন। আঞ্চলিক স্বাতন্ত্র্য ভারতবাসীর মহাজাতিত্ববোধকে কখনও ক্ষুণ্ণ করে নাই। দেশের "ভারতবর্ষ" অভিধা এবং আর্য ও আর্যেতর জাতিগণের এই দেশবাসী হিসাবে স্বীকৃতির উল্লেখ অতি প্রাচীন পুরাণগুলিতেও দেখা যায়। বিষ্ণুপুরাণে লিখিত আছে যে সমুদ্রের উত্তরে হিমালয়ের দক্ষিণস্থ ভূভাগ ভারতবর্ষ নামে আখ্যাত, এবং এই দেশজাত সন্তানেরাও 'ভারতী' নামে পরিচিত—

"উত্তরং যদ্ সমুদ্রস্য হিমাদ্রেশ্চৈব দক্ষিণম্।
বর্ষং তদ্ভারতম্ নাম ভারতী যত্র সন্ততি।"

—বিষ্ণুপুরাণম্ (৩।১)

"ওঁ গঙ্গে চ যমুনে চৈব গোদাবরী সরস্বতী
নর্মদে সিন্ধু কাবেরী জলেঽস্মিন্ সন্নিধিং কুরু।"

—এই প্রাচীন মন্ত্রটির সহিত সকল হিন্দু-সন্তানের অল্পবিস্তর পরিচয় আছে। এই মন্ত্রের রচয়িতার ধ্যানে সমগ্র ভারতের অখণ্ড রূপটি বিধৃত হইয়াছে। এই মন্ত্রটির মধ্য দিয়া উত্তরপুরুষদের সমগ্র ভারত-চেতনা ও দেশাত্মবোধ উন্মেষের উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয় নাই। কামরূপ হইতে দ্বারকা, কুমায়ুন হইতে কুমারিকা—ভারতের প্রতি প্রান্তের অধিবাসিগণ যুগে যুগে গঙ্গা, যমুনা, সিন্ধু, গোদাবরী, কাবেরী ও নর্মদাকে প্রাণদায়িনীরূপে স্বীকার করিয়া নিজেদের অখণ্ড ভারত চেতনাকে উদ্বুদ্ধ করিয়াছে। ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলস্থিত নগরীগুলিকেও নিত্য স্মরণের ব্যবস্থা এই প্রাচীন মন্ত্রটিতে দেখা যাইতেছে— "অযোধ্যা মথুরা মায়া কাশী কাঞ্চী অবন্তিকা, পুরী দ্বারাবতী চৈব সপ্তৈতা মোক্ষদায়িকাঃ।" (মহাভারত, ভীষ্ম পর্ব)

তীর্থযাত্রা স্মরণাতীত কাল হইতে ভারতবাসীর অবশ্য ধর্মীয় কর্তব্য। মহাভারতের বনপর্বে তীর্থযাত্রা পর্বাধ্যায়ে ভারতের এমন কি ভারতের বর্তমান ভৌগোলিক সীমার বাহিরেও অসংখ্য তীর্থের উল্লেখ আছে। সুপ্রাচীন যুগে ভারতবাসীর তীর্থ পর্যটনের অভ্যাস বদ্ধমূল ছিল ইহা বেশ বুঝা যায়।

ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে তীর্থ পর্যটনের মধ্যে যে অঞ্চলে তীর্থ অবস্থিত সেই অঞ্চলের সহিত মানসিক ও দৈহিক যোগাযোগের মধ্যে সমগ্র ভারত চেতনার স্বীকৃতি নিহিত আছে। প্রাচীন হিন্দু নৃপতিগণের রাজসূয় ও অশ্বমেধ যজ্ঞানুষ্ঠান, দিগ্বিজয় দ্বারা রাজচক্রবর্তিত্ব লাভের সাধনা ও রাজকন্যাদের স্বয়ম্বর সভায় সমগ্র ভারতের পরিণয়যোগ্য রাজপুত্রগণের সমাবেশ প্রমাণিত

করে যে, প্রাচীন ভারতীয়গণ নিজেদের একটি ক্ষুদ্র রাষ্ট্রের বা অঞ্চলের অধিবাসী বলিয়া মনে করিত না। সমগ্র ভারতের নাগরিকতা-বোধ তাহার চেতনায় পরিব্যাপ্ত থাকিত। প্রাক্-স্বাধীনতা যুগের অবিভক্ত ভারত অপেক্ষাও প্রাচীন ভারতবর্ষের সীমা সম্প্রসারিত ছিল। এই দেশ লইয়া প্রাচীন ভারতবাসীর সবিশেষ গর্ববোধ ছিল। তাঁহারা মনে করিতেন ভারতবর্ষে জন্মগ্রহণ করিলে দেবতারাও কৃতার্থ হইয়া যান (১)।

"জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী"

—এই ঋষি বচনের উল্লিখিত জন্মভূমিও ছিল এই ভারতবর্ষ।

ভারতবর্ষ নানা জাতি, নানা ভাষাভাষী, নানা ধর্ম ও মতাবলম্বী মানুষের দেশ ছিল, শুধু মাত্র ইংরাজ-শাসনে ভারতবর্ষ দেশ হিসাবে একটি সংহত রূপ পরিগ্রহ করে ও এক রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত হয়, ভারতীয় জাতীয়তাবোধের উন্মেষ ইংরাজের শাসনকালেই সম্ভব হইয়াছে—অনেকের মনে এইরূপ ভ্রান্ত ধারণা আছে। এই সব কারণে প্রাচীন ভারতের ভৌগোলিক সংহতি ও প্রাচীন ভারতবর্ষের ভারত-চেতনার উপলব্ধির আলোচনা প্রয়োজনবোধে করা হইল। (২)

(১) 'অদ্যাপি দেবা ইচ্ছন্তি জন্ম ভারত ভূতলে'। (৩।৫২)
'এবং ভারত ভূভাগং প্রশংসন্তি দিবৌকসঃ। (৩।৭৩)

—বৃহন্নারদীয় পুরাণম্

(২) R. K. Mookherji—Fundamental Unity of India

দ্বিতীয় অধ্যায়

পথ পরিচয়—সিন্ধুসভ্যতার যুগ

পূর্ববর্তী অধ্যায়ে ভারতের প্রাচীন-সভ্যতার অতি সংক্ষিপ্ত আভাস দেওয়া হইয়াছে। সভ্যতার এক প্রধান বাহন পথ; পথ আশ্রয় করিয়াই সভ্যতা পরিপুষ্ট অথবা বিস্তৃত হয়। সভ্যতা পথের সৃষ্টি করে ও উহা আশ্রয় করিয়াই নিজে বিকশিত হয়। পথ দুইরূপ হইতে পারে, জলপথ ও স্থলপথ; রেলপথ, বিমানপথ বা আকাশ-পথ উনবিংশ-বিংশ শতাব্দীর দান। বর্তমান পুস্তকে প্রাচীন যুগের স্থলপথের কথাই আলোচ্য।

সিন্ধুসভ্যতা সম্বন্ধে যে সব তথ্যাদি এ যাবৎ উদ্ঘাটিত হইয়াছে তাহাই শেষ কথা নহে, ভবিষ্যতে ব্যাপকতর অনুসন্ধানের ফলে হয়ত আরও অনেক কিছু জানা যাইবে। হয়ত বহু উপকরণ চিরতরে লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। স্টুয়ার্ট পিগটের মতে হরপ্পা, মহেঞ্জোদড়ো একই সময়ে বর্তমান ছিল ও ৩৫০ মাইল দূরবর্তী দুইটি নগরী একই শাসন ব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত ছিল। তাঁহার অনুমান এই যে সম্ভবতঃ এই দুইটি নগরীই ছিল রাজধানী (Capital Cities), এই দুইটি নগরী হইতে এক বিস্তীর্ণ রাষ্ট্রের যথাক্রমে দক্ষিণ ও উত্তর অঞ্চলের শাসনকার্য পরিচালিত হইত। হরপ্পা ও মহেঞ্জোদড়োর চতুষ্পার্শ্বে প্রায় ৬০টি ক্ষুদ্র জনপদ ও গ্রামেরও ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হইয়াছে। অনুসন্ধানে এইরূপ আরও জনপদের অস্তিত্ব আবিষ্কৃত হইতে পারে। মহেঞ্জোদড়ো ও হরপ্পার ধ্বংসাবশেষের মধ্যে সুবিস্তীর্ণ রাজপথের অস্তিত্ব হইতে অনুমান করা যায় যে, এই সব রাজপথ উপরোক্ত নগরী দুইটির বহির্ভাগে পরিব্যাপ্ত থাকিয়া রাষ্ট্রের এক অংশ হইতে অপর অংশে গমনাগমনের সহায়তা করিত। রাষ্ট্রের গ্রামাঞ্চলে উৎপন্ন কৃষিজ ও অন্যান্য পণ্যসম্ভার এই পথে নীত হইয়া নগরীর প্রয়োজন মিটাইত। পণ্ডিতদের মতে বর্তমান গুজরাতের সুরেন্দ্রনগর জেলার অন্তর্ভুক্ত রঙ্গপুর, উত্তর বালুচিস্তান পর্বতমালার পূর্বভাগে ডাবরকোট, দক্ষিণ বালুচিস্তনের মেহি এবং আরব সাগরের ম্যাকরান উপকূলের সুটকাজেনডোর (Sutkagendor) প্রভৃতি আবিষ্কৃত স্থানগুলি ছিল রাজ্যের প্রত্যন্তবর্তী ব্যবসায়কেন্দ্র বা ঘাঁটি।

সিন্ধুসভ্যতার অধিবাসিগণের সহিত সুমের, ক্রীট্, ঈজিপ্ট, প্রভৃতি বহির্ভারতীয় দেশসমূহের বাণিজ্যিক আদান-প্রদান ছিল, মহেঞ্জোদড়ো, হরপ্পা ও ঐ অঞ্চলের প্রাচীন স্থানগুলি খননের ফলে ইহার বহু প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে (১)। পূর্বে উল্লিখিত স্তুটকাজেনডোর নামক স্থানের সুরক্ষিত বন্দর হইতে এবং সিন্ধুনদীর মোহনায় অবস্থিত অন্যান্য স্থান হইতে বাণিজ্যিক দ্রব্যসম্ভার জলপথে অন্ততঃ পারস্য উপসাগর পর্যন্ত বাহিত হইত।

তুর্কীস্থান প্রভৃতি মধ্য-এশীয় দেশগুলির সহিত আদান-প্রদান বালুচিস্তানের মধ্য দিয়া বিভিন্ন স্থলপথে নির্বাহিত হইত।

আন্তর্বাণিজ্য ও বহির্বাণিজ্যে পটু সিন্ধুসভ্যতার নাগরিকদের মধ্যে একটি সমৃদ্ধিশালী বণিক্ শ্রেণীর উদ্ভব হইয়াছিল। এই বণিকেরা অশ্ব, উষ্ট্র অথবা বলীবর্দ বাহিত শকট শ্রেণীতে দলবদ্ধ ভাবে সুপ্রচলিত পথাবলীর উপর দিয়া বাণিজ্য যাত্রা করিত। পথের মধ্যে বিশ্রাম লাভার্থ পান্থশালার ব্যবস্থা ছিল। স্টুয়ার্ট পিগট অনুমান করেন যে, সিন্ধুপ্রদেশে অবস্থিত আমিলানো (Amilano) নামক স্থানে এইরূপ একটি পান্থশালা নগরী ছিল। বর্তমান পাকিস্তানের সিন্ধুপ্রদেশের হায়দ্রাবাদ সহর হইতে করাচী পর্যন্ত বিস্তৃত সমুদ্রকুলমুখী একটি পথের ধারে ইহা অবস্থিত ছিল। (২)

সিন্ধুসভ্যতার যে সব উপকরণ খননের ফলে আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহাদের মধ্য হইতেই এই দেশের আন্তর্বাণিজ্য ও বহির্বাণিজ্যের সাক্ষ্য মিলিতেছে। উপকরণগুলির কিছু বিলাস-উপচার, কিছু নিত্যব্যবহার্য দ্রব্য-সামগ্রী। সম্ভবতঃ বালুচিস্তান হইতে শিলাজতু, নরম পাথর এবং আফগানিস্থান হইতে এই অঞ্চলে রৌপ্য আসিত। পারস্য হইতে স্বর্ণ, টিন ও সীসক পাওয়া যাইত। আজমীর অঞ্চলজাত সীসক ও রাজপুতানা অঞ্চলের তাম্র হইতে প্রস্তুত তৈজসপত্রাদিও চূর্ণ সিন্ধুসভ্যতার ধ্বংসাবশেষের মধ্যে পাওয়া গিয়াছে। দাক্ষিণাত্যের নীলগিরি অঞ্চলজাত মণি ও মহীশূরের কোলার অঞ্চলজাত স্বর্ণ, কাশ্মীর হিমালয় অঞ্চলজাত দেবদারু কাষ্ঠ, হরিণের শৃঙ্গ ও রোগঘ্ন ঔষধি মহেঞ্জোদড়ো ও হরপ্পা হইতে পাওয়া গিয়াছে।

(১) REM Wheeler—Indus Valley Civilization (Camb. History of India—Suppl. Vol,) P. 59

(২) Stuart Piggot—Pre-Historic India, P. 175.

ইহা নিঃসন্দেহে প্রাচীন ভারতের অন্যান্য অংশের সহিত এই অঞ্চলের যোগাযোগ ব্যবস্থার অস্তিত্বের অভ্রান্ত প্রমাণ বহন করিতেছে (১)।

আর্নেস্ট ম্যাকে লিখিয়াছেন "আমরা মানসনেত্রে দেখিতে পাইতেছি যে, বণিকেরা তাহাদের দ্রব্যসম্ভার লইয়া অবিরত সিন্ধুসভ্যতার সমৃদ্ধিশালী নগরগুলিতে প্রবেশ করিতেছে ও নিষ্ক্রান্ত হইতেছে।" (২)

ম্যাকের মতে সিন্ধুনদের দক্ষিণ তীরবর্তী মহেঞ্জোদড়ো ছিল স্থলভাগস্থিত বন্দর, এখান হইতে সিন্ধুসভ্যতার অধিবাসিগণের বাণিজ্যপোত সুমের, উর, কিশ ও ঈজিপ্টের পথে যাত্রা করিত ও তদ্দেশজাত দ্রব্যসম্ভার লইয়া প্রত্যাবর্তন করিত। বহির্ভারতের সহিত এই যোগাযোগ অপেক্ষা উত্তর-দক্ষিণ ও পূর্ব-ভারতের সহিত সিন্ধুসভ্যতার অধিকারিগণের যোগাযোগ কম বিস্ময়জনক নহে। ভারতের পূর্বাঞ্চলে হাজারিবাগ, দক্ষিণাঞ্চলের নীলগিরি ও মহীশূর, উত্তরাঞ্চলে কাশ্মীর ও রাজপুতানা, পশ্চিমে আফগানিস্থান ও বালুচিস্তান অর্থাৎ চারিদিক হইতেই সিন্ধুসভ্যতার নগরীগুলিতে গমনাগমনের বাণিজ্যপথ ছিল ইহা একপ্রকার স্বতঃসিদ্ধ সিদ্ধান্ত।

স্থলপথে বাণিজ্য দ্রব্য পরিবহনের কার্যে সম্ভবতঃ অশ্ব, হস্তী, অশ্বতর, উষ্ট্র প্রভৃতি ব্যবহৃত হইত। সিন্ধুসভ্যতার অধিবাসিগণ কর্তৃক চক্রযুক্ত শকট ব্যবহারেরও প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। উৎখননের ফলে হরপ্পা ও মহেঞ্জোদড়োর ন্যায় কালিবঙ্গানে (গঙ্গানগর জেলা, রাজস্থান) সুবিন্যস্ত পথরাজির সন্ধান পাওয়া গিয়াছে (৩)।

সিন্ধু সভ্যতার নাগরিকেরা ২৫০০ খৃষ্টাব্দের পূর্বেই জলপথে ব্যবসায় বাণিজ্যে পারদর্শিতা অর্জন করিয়াছিল। ব্যবসায়-বাণিজ্য সূত্রে এই সমৃদ্ধির কারণেই প্রায় সহস্র মাইল বিস্তৃত একটি অঞ্চলে উন্নত নাগরিক সভ্যতার প্রতিষ্ঠা সম্ভব হইয়াছিল। মহেঞ্জোদড়ো হইতে ৩৫০ মাইল উত্তরে অবস্থিত হরপ্পার সহিত

(১) Wheeler—Indus Civilization, P. 59

(২) "We can visualize caravans constantly entering and departing the wealthy cities of Indus valley not only with commodities in daily demand but also materials to make object of value to delight both merchants and citizens." Ernest Mackay—Indus Valley Civilization P. 199.

(৩) A. Ghosh—Fifty years of Arch. Survey of India (Ancient India no. 9)
A. Ghosh—Archæology in India: Expedition vol VI, no. 3

যোগসূত্র ছিল এই জলপথ। মহেঞ্জোদড়ো হইতে সিন্ধুনদের মধ্য দিয়া পোতগুলি সিন্ধু ও শতদ্রু নদীর সঙ্গমে পৌঁছিত। অতঃপর পোতগুলি শতদ্রুর বক্ষ দিয়া ঝিলম নদীর মোহানায় আসিত। ঝিলম নদীতে প্রবেশের পর ইরাবতীর মোহানা মিলিত। বস্তুতঃ ইরাবতী তীরেই ছিল হরপ্পার অবস্থিতি।

জলপথে সুপ্রতিষ্ঠিত যোগাযোগযুক্ত মহেঞ্জোদড়ো ও হরপ্পা এই দুই নগরীরই সন্নিহিত অঞ্চলগুলির সহিত স্থলপথে বা জলপথে যোগাযোগ ছিল। সম্ভবতঃ হরপ্পার সহিত পূর্ব পাঞ্জাবে অবস্থিত রুপার অঞ্চলের যোগাযোগ মিশ্র প্রকৃতির ছিল অর্থাৎ কতক অংশ জলপথে ও কতক অংশ স্থলপথে নির্বাহিত হইত (১)।

১৯২৭ হইতে ১৯৩১ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত উৎখনন দ্বারা প্রত্নতাত্ত্বিক ও ঐতিহাসিক ননীগোপাল মজুমদার মহেঞ্জোদড়ো সন্নিহিত নিম্নলিখিত প্রত্নসমৃদ্ধ স্থানগুলি আবিষ্কার করেন:—আহমদশাহ, আলিমুরাদ, আমরি, আমিলানো, বাচানি, বান্ধনি, চানহুদড়ো, পউরো, ডিসোই, ঢল. ডাম্বুথি, গোরান্ডি, গাজীশাহ্ পীর, ঝাঙ্গার, ঝাঙ্গরি, ঝুকর, ওরাঙ্গি, খরুড়, কোট্রাস, বুথি, লহুমঞ্জোদড়ো, লাখিওপীড়, পেখিরান পণ্ডি, পণ্ডিওয়াহি, মীরমাজারত, সাজোকাটিরো, ট্যাণ্ডো, রহিমখান, থারো পাহাড়, ত্রৌনি ইত্যাদি (২)। আধুনিক কালে উৎখননের ফলে আরও কতকগুলি প্রত্নসমৃদ্ধ স্থান আবিষ্কৃত হইয়াছে। মহেঞ্জোদড়োর সহিত এই সব স্থানগুলির যোগাযোগ ছিল ইহা অনুমান করা অসঙ্গত হইবে না। এই যোগাযোগ সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা যাইতে পারে।

মহেঞ্জোদড়ো হইতে চানহুদড়ো হইয়া জলপথে লহুমাঞ্জোদড়ো পৌঁছান যাইত। এই স্থান হইতে—মাঞ্চার হ্রদ সন্নিহিত লাখিওপীড়, ঝাঙ্গার প্রভৃতি স্থানে যাতায়াতের জন্য সম্ভবতঃ একটি স্থলপথ ছিল। বর্তমানে পাকিস্তানের সিন্ধু প্রদেশের সেহয়ান হইতে ঝাঙ্গার ও জোহি পর্যন্ত একটি স্থলপথ আছে। সম্ভবতঃ এইটিই ঝাঙ্গার লাখিওপীড় প্রভৃতির সহিত সংযোগকারী প্রাচীন পথ। বর্তমানে সিন্ধুপ্রদেশের থানো বুলাখান নামক স্থান হইতে ওরাঙ্গি পর্যন্ত যে পথটি আছে সম্ভবতঃ সেইটিই ছিল প্রাচীন কালের ওরাঙ্গিডিসোই পথ। ওরাঙ্গি নামক স্থানটি বর্তমান পাকিস্তানের করাচি বন্দরের নিকট অবস্থিত।

(১) R. E. M. Wheeler—Early India and Pakistan, P. 94
(২) N. G. Majumdar—Explorations in Sind, Pp. 63-70, 86, 142, 144, 153.

সম্ভবতঃ ওয়াজি হইতে সমুদ্রোপকূলবর্তী কোন পথ ধরিয়া প্রাচীন কালে কাথিয়াওয়াড়ে অবস্থিত রঙ্গপুর এবং নর্মদা ও তাপ্তীর অন্তবর্তী লোথাল (গুজরাতের আমেদাবাদ জেলায়) প্রভৃতি স্থানের বাণিজ্য কেন্দ্রগুলির যোগাযোগ রক্ষা হইত। বর্তমানে সিন্ধুপ্রদেশের (পাকিস্তান) দেরাগাজি খাঁ নামক স্থান হইতে লোরালাই ও কোয়েটার মধ্য দিয়া একটি প্রাচীন পথ কান্দাহার অভিমুখে গিয়াছে। এই পথেই উত্তর বালুচিস্তানের পর্বতমালার পূর্ব সীমান্তে ডাবরকোট অবস্থিত। প্রত্নতাত্ত্বিক অনুসন্ধানের ফলে জানা গিয়াছে যে ডাবরকোট সিন্ধুসভ্যতার কালে একটি প্রসিদ্ধ বাণিজ্য কেন্দ্র ছিল। ডাবরকোটের মাধ্যমে হরপ্পার সহিত কোয়েটা কান্দাহার অঞ্চলের বাণিজ্য নির্বাহিত হইত। মহেঞ্জোদড়ো-কোয়েটা স্থলপথটি ঝুকর-লিমোজুনিজো হইয়া বোলান গিরিপথের মধ্য দিয়া প্রসারিত ছিল। বালুচিস্তানের নাল নামক প্রত্নসমৃদ্ধ স্থানটির সহিত বালুচিস্তানের অন্যান্য অংশের এবং সিন্ধু উপত্যকার যোগাযোগের প্রমাণ স্বরূপ বহু প্রত্নতাত্ত্বিক সাক্ষ্য পাওয়া যায়। বর্তমানে সিন্ধুপ্রদেশের আমরি এবং মাঞ্চার হ্রদ সন্নিহিত ঝাউ নামক স্থান হইতে মুলা গিরিপথের মধ্য দিয়া যে পথটি রহিয়াছে সেই পথটি সম্ভবতঃ প্রাচীন কালে আমরি হইতে নাল্ নদীর উপত্যকাবর্তী স্থানগুলিতে গমনাগমনের জন্য ব্যবহৃত হইত। দক্ষিণ বালুচিস্তানে অবস্থিত মেহি ছিল সিন্ধুসভ্যতার যুগের একটি প্রসিদ্ধ ব্যবসায় কেন্দ্র। নাল হইতে একটি পথ মেহির মধ্য দিয়া মাকরান উপকূলস্থ কুল্লী পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। কুল্লীর বণিকেরা সিন্ধু উপত্যকার বাণিজ্য সম্ভারগুলি পশ্চিম অঞ্চলে রপ্তানির ব্যাপারে মধ্যস্থের ভূমিকা গ্রহণ করিত। কুল্লী হইতে সিন্ধুসভ্যতার বাণিজ্য সম্ভার মাকরান উপকূলস্থ শুট্‌কাজেনডোর বন্দরে পৌছিত। বর্তমানে এই স্থান হইতে সমুদ্র বহুদূরে সরিয়া গিয়াছে। সিন্ধুসভ্যতার কালে শুট্‌কেজেনডোর হইতেই পণ্য-সামগ্রী আরবসাগর ও পারস্য উপসাগরের মধ্য দিয়া পশ্চিম এশিয়ার দেশগুলিতে যাইত (১)।

(১) Piggot—Pre-historic India, Pp. 67, 72-76, 114, 124.
Stein. —Tour in Gedrosia, Pp, 118, 137, 170-183,

তৃতীয় অধ্যায়

পথ পরিচয়—বৈদিক যুগ

ভারতে আগমন করিয়া আর্যগণ প্রথমে পাঞ্জাব অঞ্চলে বসবাস আরম্ভ করেন। ঋগ্বেদে উষার যে বর্ণনা আছে উহা পাঞ্জাব অঞ্চলে সূর্যোদয়কালীন প্রকৃতিচিত্রণ। কালক্রমে আর্যদের বংশ ও শক্তি বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে আর্যসভ্যতা পঞ্চনদ উপত্যকা হইতে পূর্বদিকে গাঙ্গেয় উপত্যকায় বিস্তৃতিলাভ করিতে থাকে। প্রথম যুগের বৈদিক সাহিত্যে এই নয়টি আর্য উপনিবেশের নাম পাওয়া যায় (১) গান্ধার (সিন্ধুনদীর উভয় তীরস্থ ভূ-ভাগ), (২) কেকয় (গান্ধার ও বিপাশা নদীর মধ্যবর্তী অংশ) (৩) মদ্র (ইরাবতী নদীর তীরবর্তী অঞ্চল), (৪) উশীনর (উত্তর পশ্চিম সীমান্ত অঞ্চল) (৫) মৎস্য (বর্তমান জয়পুর, আলোয়ার, ভরতপুর অঞ্চল), (৬) কুরু (বর্তমান দিল্লীর উত্তর-পূর্ব ভূভাগ) (৭) পাঞ্চাল (বর্তমান বেরিলী, বদাউন, ফারুকাবাদ অঞ্চল), (৮) কাশী ও (৯) কোশল (বর্তমান অযোধ্যা ও সন্নিহিত অঞ্চল)। পরবর্তীকালে অঙ্গ, মগধ, কলিঙ্গ, বৃজি, মল্ল, চেদী, বৎস, শূরসেন, অবন্তী, কম্বোজ, সৌবীর, বিদেহ প্রভৃতি রাষ্ট্রের নাম পাওয়া যায়। বৈদিক যুগে অন্ধ্র, পুলিন্দ, পুণ্ড্র, নিষাদ প্রভৃতি জাতি অধ্যুষিত রাষ্ট্রগুলি আর্যভারতের বহির্ভূত স্থান বলিয়া পরিগণিত হইত। মগধ (দক্ষিণ বিহার), অঙ্গ (পশ্চিমবঙ্গ ও পূর্ব বিহার), পুণ্ড্র ও বঙ্গ (উত্তর ও পূর্ববাঙ্গলা) ও দাক্ষিণাত্য প্রাচীন আর্যদের অজ্ঞাত ছিল না, যদিও এতদঞ্চলে আর্যসভ্যতা বিস্তৃত হইতে বহু সময় অতিক্রান্ত হইয়াছিল।

ঋগ্বেদের সময়ে কৃষি ও গো-পালন আর্যদের প্রধান জীবিকা ছিল। বণিক্ শব্দের উল্লেখ হইতে বুঝা যায় ক্রয়-বিক্রয় বৈদিক যুগে প্রচলিত ছিল (ঋগ্বেদ ১।১২২।১১)। ঋগ্বেদে সমুদ্র ও শতক্ষেপণীযুক্ত (Hundred-oared) অর্ণব-পোতের উল্লেখ আছে। সীমাহীন নিরালম্ব সমুদ্র অতিক্রম করার যে বর্ণনা ঋগ্বেদে পাওয়া যায় তাহা সম্ভবতঃ প্রাচীন আর্য বণিকদের ইজিপ্ট, ব্যাবিলন, চাল্ডিয়া প্রভৃতি দেশে বাণিজ্যযাত্রার স্মৃতি বহন করিতেছে (ঋগ্বেদ, ১।১১৬।৩)।

ব্যবসায়-বাণিজ্য ব্যপদেশে গমনাগমন, স্বচ্ছন্দ-জীবনযাত্রা, সংস্কৃতি বিস্তার প্রভৃতির জন্য পথের প্রয়োজনীয়তা অপরিহার্য। বৈদিক সভ্যতার কালে

আর্যেরা (হয়ত অনার্য ও দস্যু অভিহিত সিন্ধুসভ্যতার উত্তরাধিকারিগণের অনুকরণে) বহু গ্রাম নগরের প্রতিষ্ঠা করেন। বৈদিক আর্যেরা যে পথ প্রস্তুতে মনোযোগী ছিলেন ইহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায় বৈদিক সাহিত্যে অগ্নির পথিকৃৎ অভিধায়। দুর্গম অরণ্য প্রদেশের মধ্য দিয়া নূতন বাসস্থানের উদ্দেশ্যে যাত্রাকালে ও উপনিবিষ্ট অঞ্চলে বনজঙ্গল অগ্নিসংযোগে ধ্বংস করিয়া লওয়া হইত।

এই প্রসঙ্গে ঋগ্বেদের নিম্নলিখিত মন্ত্রগুলির মর্মানুবাদ প্রণিধেয়—

"হে পূষন্, আমাদের হিংস্র শ্বাপদ হইতে রক্ষা কর।" (১।৪২।২)।

"হে পূষন্, পথে আমাদের ধূর্ত দস্যু হইতে রক্ষা কর।" (১।৪২।৩)।

"হে পূষণ, আমরা তোমার সাহায্য প্রার্থনা করি, তুমি আমাদের পূর্বপুরুষদের যেরূপ পথ দেখাইয়া লইয়া গিয়াছ, আমাদেরও সেইরূপ লইয়া চল।" (১।৩২।৫)

"হে পূষন্, আমাদের বাধাদানকারীদের হাত হইতে রক্ষা কর। আমাদের ভ্রমণের সুবিধা করিয়া দাও (১।৪২।৭)।"

"আমাদের নূতন নূতন গোচারণ ভূমির সন্ধান দাও। আমাদের পথ সুগম করিয়া দাও (১।৪২।৮)।"

"হে অগ্নি, আমাদের প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি বহন করিবার উপযোগী পথ করিয়া দাও। আমাদের পথের বাধা দূর কর (৬।৫৩।৪)।"

আর্য-নায়ক ইন্দ্র আর্য সভ্যতার প্রথম যুগে সম্ভবতঃ বহু পথ প্রস্তুত করিয়া দিয়াছিলেন, এইগুলি স্মরণ করিয়া একটি মন্ত্রে বলা হইয়াছে—

"হে ইন্দ্র, আমাদের গো-হরণ-কারীকে তুমি বধ করিয়াছ। তুমি আমাদের ও গো-সকলের যাতায়াতের পথ সুগম করিয়াছ।" (৩।৩০।১০)

ঋগ্বেদ ও অথর্ববেদ ব্যতীত মৈত্রায়ণ (২,১,১০), কাঠক (৬,১০), তৈত্তিরীয় সংহিতা (২,২,২২), শতপথ ব্রাহ্মণ (১১,১,৫৫), গোপথ ব্রাহ্মণ (২,৬) কৌষীতকী ব্রাহ্মণ (৫,৩) ও সাঙ্খায়ন শ্রৌতসূত্রের (৩,৪১ ; ১৫,১) নানাস্থানে পথ ও পথ সম্বন্ধীয় প্রসঙ্গ উল্লিখিত আছে। ঋগ্বেদ, যজুর্বেদ ও পরবর্তী সাহিত্যে প্রশস্ত পথ ও পথ-ভ্রমণ বুঝাইতে প্রপথ শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে (১)। রথ বহনযোগ্য প্রশস্ত পথ বুঝাইতে অথর্ববেদে "পরিরথ্যা" শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে (অথর্ব, ৭,৮,২২)।

(১) "পুষাত্মা পাতু প্রপথে পুরস্তাৎ" (১০।১৭।৪)

"প্রপথে পথামজনিষ্ট পূষা, প্রপথে দিব ; প্রপথে পৃথিব্যা।" (১০।১৭।৬)

ঋগ্বেদ পরবর্তী ব্রাহ্মণগুলি হইতে এইরূপ প্রতীতি জন্মে যে, গ্রামগুলি নগরগামী মহাপথের সহিত সংযুক্ত ছিল। অথর্ববেদে সমতল হইতে উর্ধে শকট বহনযোগ্য প্রশস্ত ও দীর্ঘ পথগুলির উভয় পার্শ্বে বৃক্ষ ও নগর প্রবেশের মুখ তোরণ দ্বারা শোভিত থাকার বিবরণ আছে (অথর্ব ১৪।১।৬৩ ; ১৪।২।৬৯)।

ঋগ্বেদে একজন যাদব নৃপতিকে 'প্রপথিন্' আখ্যায় অভিহিত হইতে দেখা যায়। সম্ভবতঃ সৌরাষ্ট্র উপকূলবাসী এই নৃপতি সমুদ্রকূল পর্যন্ত বিস্তৃত এক বা একাধিক পথ প্রস্তুত করিয়া দিয়া আর্য ঋষিদের প্রশংসামূলক এই উপাধি লাভ করিয়াছিলেন (ঋগ্বেদ, ৮।১।৩০)। এই অঞ্চলের বন্দরগুলি সম্ভবতঃ প্রাক্-বৈদিক সিন্ধুসভ্যতা যুগের ন্যায় ঋগ্বেদের যুগেও কর্মমুখর ছিল।

বৈদিক সাহিত্যের আভ্যন্তরীণ সাক্ষ্য হইতে বুঝা যায় যে, প্রাচীন আর্যেরা সমুদ্রপথে বা স্থলপথে বহির্বিশ্বের সহিত ব্যবসায় বাণিজ্য পরিচালন করিতেন (ঋগ্বেদ ১।৫৬।২)। দেশের অভ্যন্তরেও ব্যবসায়-বাণিজ্য সুষ্ঠুরূপে নির্বাহিত হইত। এই প্রয়োজন পূরণের জন্য দেশের অভ্যন্তরে বহু পথের অস্তিত্ব ছিল, এইগুলির নির্দিষ্ট পরিচয় অবশ্য দেওয়া সম্ভব নহে (১)।

বৈদিক যুগের পথগুলির সঠিক অবস্থান কিরূপ ছিল তাহা নির্ণয় করা দুরূহ। সপ্তসিন্ধু অর্থাৎ সিন্ধু, বিতস্তা (ঝিলম্), অশিক্নি (চন্দ্রভাগা-চেনাব), পরুষ্ণী (ইরাবতী-রাভী) বিপাশ (বিপাশা-বিয়াস), শুতুদ্রী (শতদ্রু-সুটলেজ্) ও সরস্বতী (ঘাঘর-হাকরা) তীরবাসী আর্যেরা দীর্ঘদিন নিজেদের এই অঞ্চলের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখিতে পারেন নাই। অস্তিত্ব রক্ষার প্রয়োজনে তাঁহাদের পূর্বদেশে অভিযান করিতে এবং নূতন নূতন জনপদের পত্তন করিতে হইয়াছিল।

---

(১) দ্রষ্টব্য—"Road making proceeded side by side with Aryan Settlements. (If indeed roads were not there already, the cross-country roads feeding the ancient South West sea ports may have been much older than Aryan Settlements)......the Vedic builders were not long content with forest tracks or village paths, for even in Rigveda (and later Samhitas) we find 'Prapath' or long journey by broad roads. (Rv, x 17,46; 63,16;)

......Later on in the Brahmanas we find villages are connected with Mahapathas or high roads. Travelling seems to have been quite in common."—S. C. Sarkar—Some Aspects of the Early Social History of India (Pre-Buddhist-Ages) Pp. 14–15.

"Apart from trade with foreign countries or alien tribes there must have been quite an extensive inland trade"—R. C. Majumdar (Ed) History and Culture of the Indian people,—Vedic Age (Vol I) P 396.

শতপথ ব্রাহ্মণে লিখিত হইয়াছে যে, আর্য নৃপতি বিদেঘ মাধব তাঁহার পুরোহিত রহুগণকে লইয়া সরস্বতী নদীর তীর হইতে সদানীরা নদীর তীর ভূমি পর্যন্ত পবিত্র যজ্ঞাগ্নি বহন করিয়া লইয়া গিয়াছিলেন (১)। প্রত্ন-তাত্ত্বিকদের মতে বর্তমান হরিয়ানা রাজ্যের ঘাঘর নদীই প্রাচীন সরস্বতী নদী। এই নদীটির স্থানীয় নাম বর্তমানেও সরস্তি। হনুমানগড় নামক স্থানের পর হইতে বর্তমানে এই নদীর শুষ্ক খাত বিকানীর-ভাওয়ালপুরের দিকে প্রসারিত। রাজস্থানের মধ্যে প্রবাহিত এই নদীর শুষ্ক খাত ঘাঘর—হাক্‌রা নামে পরিচিত। হনুমানগড়ের দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে সরস্তি বা ঘাঘরের সহিত অপর একটি যে শুষ্ক খাত দেখা যায় পণ্ডিতদের মতে সেইটিই প্রাচীন কালের দৃষদ্বতী নদী। বৈদিক সাহিত্যে সরস্বতী দৃষদ্বতী এই দুইটি নদীই সুপ্রসিদ্ধ। এই অঞ্চলে সিন্ধু-সভ্যতার ও তাহার পরবর্তী কালের পোড়া মাটির পাত্র প্রভৃতি প্রত্ন নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে। শতপথ-ব্রাহ্মণের উপরোক্ত আখ্যানটি পাঞ্জাবের সরস্বতী নদীর তটভূমি হইতে সদানীরা অর্থাৎ বর্তমান বিহার রাজ্যের গণ্ডক নদের তীরবর্তী মৈথিলভাষা-ভাষী অধ্যুষিত মিথিলা অঞ্চল পর্যন্ত আর্য-সভ্যতা প্রসারের স্মৃতি বহন করিতেছে। বিদেঘ মাধবের গমন পথে আসন্দিবৎ,, পরিচক্র, কাম্পিল্য ও নিমসারের নাম পাওয়া যায়। অনুমান করা যাইতে পারে যে সরস্বতী উপত্যকা হইতে বিদেঘ মাধব যমুনা পার হইয়া আসন্দিবৎ (মীরাটের নিকট আধুনিক আসন্ধ্) আগমন করেন এবং সেখান হইতে প্রাচীন পাঞ্চালের রাজধানী কাম্পিল্যে (উত্তর প্রদেশের ফারুখাবাদ জেলায়, বর্তমান নাম কাম্পিল) আসেন। এই স্থান হইতে গঙ্গার উপকূল ধরিয়া তিনি নিমসার পৌঁছান। উত্তর রেলপথের সাণ্ডিলা স্টেশন হইতে নিমসারের (প্রাচীন নৈমিষারণ্য) দূরত্ব প্রায় ২৪ মাইল। সীতাপুর শহর হইতে গোমতী নদীর তীরস্থ এই স্থানটির দূরত্বও ২০ মাইল। সম্ভবতঃ নিমসারের নিকট গোমতী পার হইয়া বিদেঘ মাধব সরযূ ও অচিরবতী (রাপ্তী) পার হইয়া উত্তর মুখে বর্তমান বিহার রাজ্যের মিথিলা অঞ্চলে আসিয়া বসতি স্থাপন করেন। বিদেঘ মাধবের নামানুসারেই পরবর্তীকালে এই অঞ্চলের নাম হয় বিদেহ। বিদেহের অধিপতি জনকের নাম পুরাণেতিহাসে সুপ্রসিদ্ধ। বর্তমান বিহার রাজ্যের মজঃফরপুর ও দ্বারভাঙ্গা জেলা এবং মুঙ্গের ও পূর্ণিয়া জেলার কতক

(১) শতপথ ব্রাহ্মণ (১।৪।১১-১৭)—S.B.E. Vol XII, P. 104

অংশ লইয়া উত্তরে নেপালের তরাই অঞ্চল পর্যন্ত প্রাচীন বিদেহ রাজ্যের বিস্তৃতি ছিল। বিদেহের রাজধানী ছিল মিথিলা। পূর্বোত্তর রেলপথের জনকপুর স্টেশনের নিকট এই প্রাচীন নগরটি অবস্থিত ছিল।

শতপথ ব্রাহ্মণে উল্লিখিত বিদেঘ মাধবের গমন পথ ছিল— হস্তিনাপুর, পরিচক্র (সম্ভবতঃ এটোয়ার ষোল মাইল দক্ষিণ পশ্চিমে অবস্থিত বর্তমান চক্রনগর) ও কাম্পিল্য। আধুনিক কালে এই স্থানগুলি হইতে উৎখননের ফলে ধূসর বর্ণের যে মৃৎভাণ্ডাংশ পাওয়া গিয়াছে বৈজ্ঞানিক পরীক্ষায় তাহার বয়স ১৫০০ হইতে ৫০০ খ্রীঃ পূঃ অব্দ। পণ্ডিতদের ধারণা যে হরপ্পা সভ্যতার অধিবাসিগণকে পর্যুদস্ত করিয়া সরস্বতী উপত্যকা হইতে গঙ্গা-যমুনা উপত্যকায় আর্যদের বসতি স্থাপন আনুমানিক ১৫০০ খৃষ্টাব্দের পরে আরম্ভ হয়। দেখা যাইতেছে যে সরস্বতী উপত্যকা হইতে গঙ্গা যমুনা উপত্যকা হইয়া বিদেঘ মাধবের উত্তর বিহার অভিযানের ঐতিহাসিক সাক্ষ্য মিলিতেছে।

আধুনিক কালে ভারতীয় প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ কর্তৃক উৎখননের ফলে সিমলা শৈলের পাদমূলে রুপার হইতে পানিপথ, তিলপাট, ভাগপাট, ইন্দ্রপ্রস্থ হইয়া মথুরা পর্যন্ত ভূভাগে ধূসর বর্ণমণ্ডিত যে মৃৎভাণ্ডাংশ পাওয়া গিয়াছে, তাহা হইতে সরস্বতী উপত্যকা হইতে ধীরে ধীরে গঙ্গা যমুনা উপত্যকায় একটি পথ ধরিয়া আর্যগণের এই অঞ্চলে বসতি স্থাপনের ইঙ্গিতও পাওয়া যাইতেছে।

মথুরা হইতে কৌশাম্বী পর্যন্ত পথটি সম্ভবতঃ বৈদিক যুগে সৃষ্ট হইয়াছিল। শতপথ ব্রাহ্মণে কাশী ও কৌশাম্বীর উল্লেখ আছে (এলাহাবাদের নিকট কোশাম ১২।২।৬; ১৩।৩।৪)। সম্ভবতঃ কোশাম হইতে গঙ্গার তটভূমি ধরিয়া কাশী পর্যন্ত একটি পথও ব্রাহ্মণ রচনার যুগে বর্তমান ছিল। কোশাম ও কাশী (রাজঘাট) উভয়স্থানেই আর্যকালীন মৃৎভাণ্ডাংশ পাওয়া গিয়াছে (১)।

বৈদিক সাহিত্য হইতে জানা যায় যে নর্মদা নদী তীরে মাহিষ্মতী নগরে অনার্য বংশীয় নাগগণের আধিপত্য ছিল, হৈহয় বংশীয় আর্যগণ আনুমানিক ১৮০০ খৃঃ পূর্বাব্দে ইহাদের পর্যুদস্ত করিয়া নিজেদের প্রভুত্ব স্থাপন করেন। এই আর্যেরা সরস্বতী উপত্যকা হইতে সম্ভবতঃ বিকানীর, আজমীর, উজ্জয়িনীর পথ ধরিয়া

(১) দ্রষ্টব্য—Ancient India (Archæological Survey of India) New Delhi, 1946-63; Archaeology of India (Bureau of Education India, pub. No, 66)

S. R Das,—An approrach to Indian Archæology, P 101, 102, 104

নর্মদা উপত্যকায় পৌঁছান—এই পথের নানাস্থানেও প্রত্নতাত্ত্বিক উৎখননের ফলে আর্যকালীন মৃৎভাণ্ডাংশ আবিষ্কৃত হইয়াছে। মহেশ্বর বা মাহিষ্মতীতে (মধ্য প্রদেশের পশ্চিম নিমার জেলায় ইন্দোরের ষাট মাইল দক্ষিণে) উৎখননের ফলে কতকগুলি বিশেষ ধরণের পানপাত্র (Cup) পাওয়া গিয়াছে। বৈজ্ঞানিক পরীক্ষায় (কার্বন-১৪) এইগুলি ১৭০০ হইতে ১১০০ খৃঃ পূর্বাব্দে নির্মিত বলিয়া অনুমিত হইয়াছে। (১)। মাহিষ্মতী অধিকারের পূর্বেই হৈহয় বংশীয়গণ অবন্তী (উজ্জয়িনী) অধিকার করিয়াছিলেন (২)।

১) Ancient India—Vols. 10-11, Pp 138-142; Indian Archæology : A Review, 1958-59, P. 45

২) Pargiter—Ancient Indian Historical Tradition, P 102.

চতুর্থ অধ্যায়

পথ পরিচয়—পৌরাণিক যুগ

রামায়ণ ও মহাভারতের ঘটনাকাল প্রসঙ্গে পণ্ডিতগণের মধ্যে মতভেদ আছে। পরলোকগত রমেশচন্দ্র দত্তের মতে আনুমানিক খৃষ্টপূর্ব ১৪০০ অব্দে ও আচার্য যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধির মতে খৃঃ পূঃ ১১৪২ অব্দে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ সংঘটিত হয়। ঐতিহাসিক সি. ভি. বৈদ্যের মতে খৃষ্টপূর্ব ৩১০১ অব্দে ভারত-যুদ্ধ অনুষ্ঠিত হয়—দেশীয় পণ্ডিতেরা অধিকাংশই শেষোক্ত মতের সমর্থক। পার্জিটারের মতে আনুমানিক ৯৫০ খৃঃ পূর্বাব্দে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এই মতটিই সর্বাধিকরূপে গৃহীত (১)। রামায়ণ নায়ক রামচন্দ্র মহাভারত নায়ক শ্রীকৃষ্ণের প্রায় ৭৫০ বৎসর পূর্ববর্তী ছিলেন। রামায়ণ ও মহাভারতের ঘটনাকালের ন্যায় রচনা কাল লইয়াও মতভেদ আছে। ডাঃ উইণ্টারনিট্‌জ-এর মতে মহাভারতের আখ্যান ভাগ যতই প্রাচীন হউক না কেন, খৃঃ পূঃ চতুর্থ শতাব্দীর পূর্বে মহাকাব্য-রূপে ইহার অস্তিত্ব ছিল না অথবা থাকিলেও উহা সুপরিজ্ঞাত ছিল না। মহাভারতের প্রচলিত-রূপ খৃষ্টপূর্ব চতুর্থ হইতে চতুর্থ খৃষ্টাব্দ—এই দীর্ঘকালের সৃষ্টি। দেশীয় পণ্ডিতেরা অবশ্য মহাভারতের এই আরোপিত আধুনিকতা স্বীকার করেন না।

ডাঃ উইণ্টারনিট্‌জের মতে রামায়ণ সম্ভবতঃ খৃঃ পূঃ ৩য় শতাব্দীতে প্রচলিত রামোপাখ্যান অবলম্বনে রচিত হইয়াছিল (২)।

রামায়ণ, মহাভারত ও অন্যান্য পুরাণাদিতে যে সব তথ্য পাওয়া যায় তাহা শুধু পুস্তক দুইটি রচনা কালেরই নহে। প্রাচীনতর সময়ের অর্থাৎ শ্রীরামচন্দ্র, শ্রীকৃষ্ণ, যুধিষ্ঠিরাদির সমকালীন তথ্যাবলীও যে বহুল পরিমাণে এই গ্রন্থদ্বয়ে সন্নিবিষ্ট আছে ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। এক শ্রেণীর ব্যক্তি বৈদিক-কাল হইতেই প্রাচীন রাজগণের কীর্তি-কাহিনী ও বংশ-তালিকা স্মৃতি বদ্ধ করিয়া রাখিত এবং ইহাই ছিল পুরাণ রচনার ভিত্তি। রামায়ণ মহাভারতের কালে আর্য সভ্যতা সমধিক বিকাশ প্রাপ্ত হইয়াছিল। রামায়ণ মহাভারত পাঠে

---

(১) Pargiter—Ancient Indian Historical Tradition, Pp. 179-180.

(২) Winternitz.—A History of Indian Literature (Vol 1), Pp. 454-95.

ইহা সহজেই হৃদয়ঙ্গম করা যায়। প্রথমেই রামায়ণের আলোচনা করা যাইতে পারে। রামায়ণে দেখিতে পাওয়া যায় যে বর্ণিত নগরীগুলির পথের দুই পার্শ্বে নানাদ্রব্য সমন্বিত বিপণিশ্রেণী ও বণিকেরা বিরাজমান (অযোধ্যা, বাল, সুন্দর ও উত্তরা কাণ্ড)। ইহা সে যুগে ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নত অবস্থার পরিচায়ক। দেশে গমনাগমনের জন্য পথের অস্তিত্ব না থাকিলে বিপণি সম্ভারে সুসজ্জিত পথ ও বণিক্ শ্রেণীর অস্তিত্ব সম্ভব হইত না।

রামায়ণের বালকাণ্ডে (১১-১৩) লিখিত আছে যে, দশরথ অন্তঃপুরিকা ও অমাত্যদের সহিত ঋষ্যশৃঙ্গকে আনয়নার্থ অযোধ্যা হইতে অঙ্গ রাজ্যে গমন করেন (পূর্ব বিহার ও পশ্চিমবঙ্গ অঞ্চল)। ঋষ্যশৃঙ্গ ও তদীয় পত্নী শান্তা সহ তাঁহারা পুনরায় অযোধ্যায় প্রত্যাবর্তন করেন। অযোধ্যা হইতে অঙ্গরাজ্য পর্যন্ত গমনাগমনের পথটি সুগম না হইলে দশরথ কখনও রাজ-অন্তঃপুরিকাদের সঙ্গে লইয়া সুদূর অঙ্গরাজ্যে যাইতে পারিতেন না।

রাম লক্ষ্মণের কৈশোর কালে ঋষি বিশ্বামিত্র তাঁহাদের দুইজনকে লইয়া রাক্ষস বধার্থে অযোধ্যা হইতে যাত্রা করেন। সরযূ নদীর দক্ষিণ তীর ধরিয়া তাঁহারা সরযূ ও গঙ্গার সঙ্গম স্থল (ছাপরার দক্ষিণে) ছাড়াইয়া কিছুদুর অগ্রসর হইবার পর একস্থানে নৌকাযোগে গঙ্গা পার হন, অতঃপর তাঁহারা এক অরণ্যে পৌছান। এই অরণ্যটির নাম ছিল তাড়কাবন। এখানে তাড়কা বধ করা হয়। তারপর বিশ্বামিত্রের আশ্রমের নিকট মারীচ ও সুবাহু জয়ের পর বিশ্বামিত্র তাঁহাদের লইয়া উত্তর দিকে অগ্রসর হন। একশত ঋষি শকটসহ তাঁহাদের অনুগমন করেন। ইহা হইতে এতদঞ্চলে শকট বহনযোগ্য প্রশস্ত পথের অস্তিত্বের প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে। শোণ-নদের তীর ধরিয়া তাঁহারা গঙ্গাতীরে পৌছান। নৌকাযোগে গঙ্গা পার হইয়া গঙ্গার উত্তর তীরে বিশালা পুরীতে (বর্তমান বশার গ্রাম—মজঃফরপুরের কুড়ি মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে) রাত্রি যাপন করিয়া তাঁহারা পরদিন বিদেহের রাজধানী জনকপুর পৌছান (বালকাণ্ড)। এখানে রাম হরধনু ভঙ্গ করেন। সীতার সহিত তাঁহার পরিণয় স্থিরীকৃত হইলে দশরথকে আমন্ত্রণার্থ অযোধ্যায় দূত প্রেরিত হয়। অতঃপর হৃষ্ট-দশরথ স্বয়ং রথে মিথিলার অভিমুখে যাত্রা করেন, চতুরঙ্গ সেনা তাঁহার পশ্চাদ্‌গামী হয়। বশিষ্ঠ, বামদেব, জাবালি প্রভৃতি ঋষিরা বিবিধ শকটে করিয়া যাত্রা করেন। অযোধ্যা হইতে মিথিলা যাওয়ার পথ যে বেশ সুগম ছিল তাহার প্রমাণ শকট ব্যবহার হইতেই পাওয়া যাইতেছে (বালকাণ্ড, রামায়ণ)।

অযোধ্যাকাণ্ডে (৪৫-৪৮) দেখা যায় যে বনবাসের আদেশপ্রাপ্ত রাম লক্ষ্মণ ও সীতা সহ সুমন্ত্রের রথে তমসা, গোমতী ও সন্দিকা নদী অতিক্রম করিয়া প্রয়াগ হইতে বাইশ মাইল উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত গঙ্গার উত্তর তীরে শৃঙ্গবের পুরে (আধুনিক শৃঙ্গাউর) আগমন করেন। এই স্থান হইতে সুমন্ত্র রথসহ অযোধ্যায় প্রত্যাবর্তন করেন। সুমন্ত্রকে বিদায় দিয়া রামচন্দ্র লক্ষ্মণ ও সীতা সহ গঙ্গা উত্তীর্ণ হইয়া প্রয়াগে ভরদ্বাজ মুনির আশ্রমে আগমন করেন। এই স্থান হইতে যমুনা পার হইয়া তাঁহারা চিত্রকূট আগমন করেন। শৃঙ্গবের পুর হইতে রথযোগে অযোধ্যা প্রত্যাবর্তনে সুমন্ত্রের দুইদিন লাগিয়াছিল।

এদিকে অযোধ্যায় পুত্রশোকাতুর বৃদ্ধ রাজা দশরথের মৃত্যু হইলে ভরতকে আনয়নার্থ দূতেরা বেগবান অশ্বসহ কেকয় দেশের রাজধানী গিরিব্রজের উদ্দেশ্যে যাত্রা করে। কানিংহামের মতে বর্তমানে এই স্থানটি জালালপুর নামে পরিচিত। পাঞ্চাল দেশ (বেরিলী, বদাউন অঞ্চল), হস্তিনাপুর (হসনাপুর, উত্তর প্রদেশের মীরাট অঞ্চল), কুরুক্ষেত্র, শাকল (আধুনিক শিয়ালকোট), তক্ষশিলা হইয়া বিপাশা নদী পার হইয়া দূতগণ কেকয় রাজ্যের রাজধানী গিরিব্রজে পৌঁছায় (এই গিরিব্রজ মগধের গিরিব্রজ নহে)। গান্ধার রাজ্য (বর্তমান পাকিস্তানের রাওলপিণ্ডি ও পেশোয়ার অঞ্চল) ও বিপাশা নদীর মধ্যবর্তী অঞ্চল রামায়ণের যুগে কেকয় দেশ নামে অভিহিত ছিল। দূতেরা ভরতকে লইয়া সাতদিন পর শ্রীহীন অযোধ্যায় প্রত্যাবর্তন করিয়াছিল।

রামায়ণের যুগে পশ্চিম পাঞ্জাব হইতে অযোধ্যা পর্যন্ত একটি পথের অস্তিত্ব এই ঘটনায় জানা যাইতেছে (রামায়ণম্-২।৬৮, ২।৭১)।

অযোধ্যায় প্রত্যাবর্তন করিয়া ভরত রামকে ফিরাইয়া আনার জন্য কৃতসঙ্কল্প হইলেন। অযোধ্যা হইতে নিষাদরাজ্য শৃঙ্গবেরপুর পর্যন্ত পথটি সম্ভবতঃ প্রশস্ত ছিল না—সুমন্ত্রের নিকট ভরত এই সংবাদ পাইয়া থাকিবেন। ভরত বর্তমানে অযোধ্যার অধীশ্বর—অযোধ্যার প্রকৃত অধীশ্বরকে ফিরাইয়া আনার মত আড়ম্বর সম্ভবতঃ ভরতের ঈপ্সিত ছিল। তাই তিনি সুপ্রশস্ত পথ নির্মাণার্থে ভূমি বিশেষজ্ঞ, সূত্রকর্মজ্ঞ (জরীপ কারক), খনক, বৃক্ষচ্ছেদক, পদপ্রদর্শক প্রভৃতি নিযুক্ত করিলেন। অযোধ্যা হইতে শৃঙ্গবেরপুর পর্যন্ত পথ নির্মিত হইলে বহু সৈন্যসামন্ত শকটাদি লইয়া ভরত রামকে আনিতে চলিলেন—অযোধ্যাকাণ্ডের এই বিবরণ হইতে তৎকালীন যুগে পথনির্মাণ পদ্ধতির ইঙ্গিত পাওয়া যাইতেছে (রামায়ণম্—২।৮০)।

শৃঙ্গবেরপুরে আসিয়া নিষাদরাজের সাহায্যে নৌকাযোগে গঙ্গাপার হইয়া ভরত প্রয়াগে (এলাহাবাদ) আসিলেন। ভরদ্বাজ ঋষির নিকট রাম চিত্রকূটের দিকে গিয়াছেন জানিয়া ভরতও চিত্রকূটে উপস্থিত হইলেন। রামের ভরতের সহিত মিলন হইল, তবে রাম পিতৃসত্য লঙ্ঘন করিয়া অযোধ্যায় প্রত্যাবর্তনে সম্মত হইলেন না। ভগ্নমনোরথ ভরত পরিজনসহ যে পথে আসিয়াছিলেন সেইপথেই অযোধ্যায় প্রত্যাবর্তন করিলেন (রামায়ণ, অযোধ্যা, ১১৭-১১৯)। অতঃপর রাম সীতা ও লক্ষ্মণ সহ চিত্রকূট হইতে দণ্ডকারণ্যের মধ্য দিয়া অত্রি আশ্রমে আসেন। এখান হইতে তাঁহারা মহাষবা (নর্মদা) পার হইয়া পাঁচমারি অরণ্যে প্রবেশ করেন। তারপর বেনগঙ্গা নদী পার হইয়া এই নদীর অপর পারে যথাক্রমে দুইবার সুতীক্ষ্ণ ও অগস্ত্য মুনির আশ্রমে বিশ্রাম করেন। অতঃপর তাঁহারা জনস্থানের নিকট গোদাবরী তীরে আশ্রম নির্মাণ করিয়া বাস করিতে থাকেন। এই স্থানটি বর্তমান অন্ধ্র রাজ্যের বিদর জেলায় অবস্থিত। কাহারও কাহারও মতে এই স্থানটি ছিল বর্তমান নাসিক শহরের নিকট (রামায়ণম্—অরণ্য, ২-১২)। এই স্থান হইতে সীতা অপহরণের পর রামলক্ষ্মণ সীতা অন্বেষণে বাহির হইয়া কিষ্কিন্ধ্যায় (তুঙ্গভদ্রা নদীর দক্ষিণ তীরে, বেলারির নিকট) পৌছান (১)। বানররাজ সুগ্রীবের সহিত তাঁহাদের মিত্রতা স্থাপিত হওয়ার পর রামের অনুরোধে বানররাজ সুগ্রীব কিষ্কিন্ধ্যার চতুর্দিকে সীতা অন্বেষণার্থ তাঁহার অনুচরবর্গকে প্রেরণ করেন। পূর্বদিকে সীতা অন্বেষণের জন্য বিনত নামক বানর বীরকে নেতৃত্ব দেওয়া হয়। বিনত গঙ্গা, সরযু, কৌশিকী, যমুনা, সরস্বতী, শোণ, সিন্ধু প্রভৃতি নদী তীরবর্তী স্থানসমূহ ও বিদেহ, মালব, কাশী, কোশল, মগধ, পুণ্ড্র, অঙ্গদেশে গমন করে। বৃহদ্বলের নেতৃত্বে একদল বানর সৈন্য দক্ষিণ দিকে প্রেরিত হয়। ইহারা উৎকল, বিদর্ভ, মৎস্য, কলিঙ্গ, দশার্ণ, অবন্তী, পাণ্ড্যদেশ প্রভৃতি স্থানে সীতা অন্বেষণে গিয়াছিল। সুষেণের নেতৃত্বে একটি বানর বাহিনী সৌরাষ্ট্র, বাহ্লীক, প্রভৃতি পশ্চিম দেশের দিকে প্রেরিত হইয়াছিল। বানর-নায়ক শতবলের নেতৃত্বে অপর এক বানর বাহিনী ম্লেচ্ছ, পুলিন্দ, শূরসেন (মথুরা অঞ্চল,) কম্বোজ ও যবন রাজ্যে প্রেরিত হইয়াছিল। ইহাদের শেষ গন্তব্য স্থল ছিল উত্তর কুরু ও উত্তর সমুদ্র।

(১) Pargiter—The Geography of Rama's Exile—Journal of the Royal Asiatic Society (London) 1894, Pp-245-250.

হনুমান বিশেষ ভাবে ভারপ্রাপ্ত হইয়া অঙ্গদের সহিত দক্ষিণ দেশে সীতা অন্বেষণের জন্য প্রেরিত হন। সমুদ্র লঙ্ঘন করিয়া হনুমান একাকী লঙ্কায় (সিংহল—শ্রীলঙ্কা) পৌঁছান ও লঙ্কার রাজধানী সংলগ্ন অশোক বনে বন্দিনী সীতার সন্ধান পান এবং কিষ্কিন্ধ্যায় ফিরিয়া রাম-লক্ষ্মণ ও সুগ্রীবকে এই সংবাদ জ্ঞাপন করেন (কিষ্কিন্ধ্যা, ৪০-৪৪)। অতঃপর সুগ্রীব ও বানরসৈন্যের সাহায্যে সহ্য, মহেন্দ্র ও মলয় পর্বত এবং সমুদ্র পার হইয়া রাম লক্ষ্মণ লঙ্কায় যান ও রাবণবধ করিয়া সীতা উদ্ধার করেন। লঙ্কাযাত্রা কালে কিষ্কিন্ধ্যা হইতে সমুদ্রকূল পর্যন্ত পথপ্রদর্শকের কর্মভার বানর সেনাপতি নীলের উপর ন্যস্ত ছিল। মনে হয়, কিষ্কিন্ধ্যা (তুঙ্গভদ্রা নদীর দক্ষিণ তীরে আধুনিক বিজয়নগর ও বেলারির নিকট) হইতে সমুদ্রকূল পর্যন্ত একটি পথ পূর্বেই ছিল— নীল এই পথ প্রয়োজন মত বিস্তৃত বা সংস্কৃত করিয়া দেন। রামের অযোধ্যায় প্রত্যাবর্তন ও রাজ্য প্রাপ্তির পর ভরত তাঁহার দুইপুত্র ও শ্যালকের সহায়তায় 'গন্ধর্ব রাজ্য' জয় করেন। গন্ধর্ব রাজ্যে তিনি তাঁহার দুই পুত্র তক্ষ ও পুষ্কলের নামে তক্ষশিলা ও পুষ্কলাবতী নামে দুইটি নগরী প্রতিষ্ঠিত করেন। পশ্চিম সীমান্তের সহিত কোশল রাজ্যের যোগাযোগ পূর্ব হইতেই ছিল ; এখন উহা দৃঢ়ীভূত হয়। লক্ষ্মণানুজ শত্রুঘ্ন মথুরাপুরী জয় করিয়া তথায় রাজত্ব করিতে থাকেন। এখানে অযোধ্যা হইতে মথুরাগামী একটি পথের সন্ধান মিলিতেছে। (রামায়ণম্—উত্তরকাণ্ড, ৬৪ সঃ)

সীতানির্বাসনের পর রাম স্বর্ণ-সীতার মূর্তিসহ অশ্বমেধ যজ্ঞ সম্পন্ন করেন, এই যজ্ঞ উপলক্ষ্যে নানাদেশীয় রাজন্যবৃন্দ ও মুনি ঋষিরা অযোধ্যায় সমাগত হন। এই ঘটনায় অযোধ্যা হইতে সর্বভারতব্যাপী পথাবলীর অস্তিত্বের ইঙ্গিতও পাওয়া যাইতেছে।

মহাভারতের ভৌগোলিক পরিধি রামায়ণ অপেক্ষাও বিস্তৃত।

অর্জুনবনবাসপর্বে (আদিপর্ব, ২১৫-২২০) দেখা যায় অর্জুন অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ ও মণিপুর হইতে পশ্চিম উপকূলের তীর্থগুলি পরিভ্রমণ করিয়া প্রভাস তীর্থে শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলিত হন। খাণ্ডবপ্রস্থে (পুরাতন দিল্লী) যুধিষ্ঠির নিজ রাজধানী স্থাপন করার পর শ্রীকৃষ্ণ সুদূর দ্বারকা হইতে প্রায়ই খাণ্ডবপ্রস্থে আগমন করিতেন। ইহা হইতে দ্বারকা হইতে খাণ্ডবপ্রস্থ পর্যন্ত গমনাগমনের দীর্ঘ পথের অস্তিত্ব অনুমান করা যায়। সভাপর্বে (১৯শ অধ্যায়) খাণ্ডবপ্রস্থ বা ইন্দ্রপ্রস্থ (দিল্লী) হইতে মগধের তৎকালীন রাজধানী গিরিব্রজ (বর্তমান রাজগীরের নিকট) পর্যন্ত একটি পথের বিবরণ

পাওয়া যায়। (১) এই পথ দিয়া শ্রীকৃষ্ণ ভীম ও অর্জুন সহ জরাসন্ধ বধার্থ গিরিব্রজে উপস্থিত হন। কুরুদেশ, কুরুজাঙ্গল ও পূর্বকোশলের মধ্য দিয়া তাঁহারা গঙ্গা ও শোন নদের সঙ্গমস্থলে পৌছাইয়া তদনন্তর মগধের রাজধানী গিরিব্রজে উপস্থিত হন।

সভাপর্বের দিগ্বিজয় পর্বাধ্যায়ে (২৬-২৮) অর্জুন যে সব দেশ জয় করেন তাহার মধ্যে প্রাগ্‌জ্যোতিষ (আসাম), কাশ্মীর, বাহ্লীক (Bactria) ও কম্বোজ (সম্ভবতঃ উত্তর আফগানিস্তানের কান্দাহার অঞ্চল)-এর নাম পাওয়া যায়।

ভীম দিগ্বিজয়ার্থ বাহির হইয়া বিদেহ, দশার্ণ, (ছত্রিশগড় অঞ্চল, মধ্যভারত) চেদি (বুন্দেলখণ্ড), কোশল, কাশী, মগধ, মোদাগিরি (মুঙ্গের), পুণ্ড্র, বঙ্গ, তাম্রলিপ্ত, সুহ্ম (পশ্চিমবঙ্গের রাঢ়অঞ্চল), লৌহিত্য (ব্রহ্মপুত্রনদের উত্তর অঞ্চল) প্রভৃতি দেশের রাজাদের পরাস্ত করিয়া তাঁহাদের আনুগত্য ও উপঢৌকনাদি অর্জন করিয়া ইন্দ্রপ্রস্থ প্রত্যাবর্তন করেন (সভা ২৯-৩০)। সহদেব মথুরা, মৎস্য (জয়পুর, আলোয়ার, ভরতপুর অঞ্চল) অবন্তী (বর্তমান মধ্যপ্রদেশের পশ্চিমাঞ্চল), পাণ্ড্য, (তিনিভেলী, মাদুরা), মাহিষ্মতী (ইন্দোরের চল্লিশ মাইল দক্ষিণে বর্তমান মধ্যপ্রদেশের অন্তর্গত) হইয়া শূর্পারক (সোপারা, বর্তমান মহারাষ্ট্রের থানা জেলায়) আগমন করেন। এখান হইতে তিনি সাগরদ্বীপবাসী নৃপতিদের জয় করিতে যাত্রা করেন। মহাভারতে বর্ণিত সাগরদ্বীপ সম্ভবত সুমাত্রা—কাহারও কাহারও মতে সাগরদ্বীপ গুজরাটের কচ্ছদ্বীপ। শেষোক্ত এই অনুমানই সঙ্গত মনে হয়। সহদেব কর্তৃক যবনপুরের নৃপতিগণের নিকট দূত প্রেরণেরও উল্লেখ আছে। ইহা সম্ভবতঃ গ্রীস ও রোমের তদানীন্তন নৃপতিদের নিকট দূত প্রেরণের ইঙ্গিত (সভা—৩১)।

নকুল দিগ্বিজয়ার্থ বাহির হইয়া পাঞ্জাবের রোহতক (পাঠানকোটের নিকট) পর্যন্ত গমন করেন। সেখান হইতে শৈরীষক বা শিরষা (পাঞ্জাব) হইয়া দক্ষিণমুখে গিয়া আবার পঞ্চনদপ্রদেশে আগমন করেন। শাকল (বর্তমান পাকিস্তানের শিয়ালকোট অঞ্চল), মদ্র প্রভৃতি রাজগণের আনুগত্য লাভ করিয়া তিনি ইন্দ্রপ্রস্থে প্রত্যাগমন করেন (সভা—৩২)।

---

(১) মহাভারতের যুগে পাটলিপুত্রের অস্তিত্ব ছিল না। বুদ্ধের সমসাময়িক কালে মহারাজ অজাতশত্রু এই স্থানে একটি সুরক্ষিত দুর্গ নির্মাণ করেন। তাঁহার পুত্র অথবা পৌত্রের রাজত্বকালে এই স্থানটি রাজধানীতে পরিণত হয়।

ভ্রাতৃগণের সাহায্যে সমগ্র ভারতের রাজচক্রবর্তিত্ব লাভ করিয়া যুধিষ্ঠির রাজসূয় যজ্ঞের আয়োজন করেন। তাঁহার আমন্ত্রণে সুদূর পশ্চিমের গান্ধার, বাহ্লীক, সিন্ধু (সিন্ধু নদের পশ্চিম উপত্যকা অঞ্চল) হইতে পূর্বভারতের প্রাগ্‌জ্যোতিষ, পুণ্ড্র (উত্তরবঙ্গ), বঙ্গ, কলিঙ্গ (ওড়িশার উপকূল অঞ্চল), উত্তরপ্রান্তের কাশ্মীর ও পার্বত্য অঞ্চল হইতে দক্ষিণের দ্রাবিড় নৃপতিগণ অর্থাৎ সমগ্র ভারত ও প্রত্যন্তবর্তী দেশের রাজগণ ইন্দ্রপ্রস্থে সমাগত হন। মহাভারতের কালে গমনাগমনের জন্য দূরগামী প্রশস্ত পথ না থাকিলে রাজন্যগণ প্রচুর উপঢৌকন ও আড়ম্বরসহ ইন্দ্রপ্রস্থে সমবেত হইতে পারিতেন না। সভাপর্বে আরও দেখা যায় যে ইন্দ্রপ্রস্থ নগরীতে ব্যবসায়-বাণিজ্যার্থে বহু বণিক এমন কি সমুদ্রপারবর্তী বণিকেরাও সমাগত হইয়াছে (সভা ৩৪-৩৫)।

মহাভারতের নলোপাখ্যানে দেখা যায় যে রাজ্যচ্যুত নলরাজা নিষধ রাজ্যের (গোয়ালিয়র হইতে ৪০ মাইল দক্ষিণে অবস্থিত অঞ্চল) সীমান্তে দাঁড়াইয়া পত্নী দময়ন্তীকে বলিতেছেন—

"এতে গচ্ছন্তি বহবঃ পন্থানো দক্ষিণাপথম্।
অবন্তীম্ ঋক্ষবন্তঞ্চ সমতিক্রম্য পর্বতম্॥
এষ বিন্ধ্যো মহাশৈলঃ পয়োষ্ণী চ সমুদ্র গা।
আশ্রমাশ্চ মহর্ষীণাং বহুমূল ফলান্বিতাঃ॥
এষ পন্থা বিদর্ভাণাম্ অসৌ গচ্ছতি কোসলান্।
অতঃপরঞ্চ দেশোঽয়ং দক্ষিণে দক্ষিণা পথঃ॥"

(বনপর্ব, ৬১।২১-২৩)।

[এই স্থান হইতে বহু পথ অবন্তী রাজ্য (বর্তমান মধ্যপ্রদেশের পশ্চিমাঞ্চল) ও ঋক্ষবন্ত (মালবের দক্ষিণে বিন্ধ্যপর্বতের অংশ বিশেষ) পর্বত অতিক্রম করিয়া দক্ষিণাপথ অর্থাৎ দাক্ষিণাত্যের দিকে গিয়াছে। এইটি বিন্ধ্য গিরি ; এইটি সমুদ্রগামী পয়োষ্ণী নদী (আধুনিক কালে পাইন বা পাইনগঙ্গা নামে পরিচিত)। এইগুলি সব মহর্ষিদের আশ্রম—এই আশ্রম সমূহে বহুবিধ ফলমূল উৎপন্ন হয়। এই স্থান হইতে একটি পথ কোসলের দিকে গিয়াছে (সম্ভবতঃ এখানে কোসল বলিতে দক্ষিণ কোসল অর্থাৎ মধ্যপ্রদেশের পূর্ব ও দক্ষিণ ভাগ বিলাসপুর, রায়পুর, সম্বলপুর অঞ্চল বুঝাইতেছে), অন্য একটি পথ বিদর্ভের দিকে গিয়াছে (বর্তমান বেরার অঞ্চল)। এই আর একটি পথ দক্ষিণ দিকে গিয়াছে অথবা এই দেশগুলি অতিক্রম করিলে দক্ষিণের দেশসমূহে যাওয়ার পথ পাওয়া যাইবে]।

নলের কথা শুনিয়া দময়ন্তীর ধারণা জন্মে যে রাজ্যভ্রষ্ট নল দময়ন্তীকে সঙ্গে রাখিতে চাহেন না বলিয়াই তাঁহাকে বাপের বাড়ীর পথ অর্থাৎ বিদর্ভে যাওয়ার পথ দেখাইয়া দিতেছেন। নল ভীতা দময়ন্তীকে সান্ত্বনা দিয়া বলেন যে এরূপ ইচ্ছা তাঁহার নাই, তথাপি ভ্রষ্টবুদ্ধি নল নিদ্রিতা দময়ন্তীকে বনমধ্যে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যান। তিনি মনে করিয়াছিলেন যে দময়ন্তী কোন ক্রমে বিদর্ভ রাজ্যে গিয়া পিতার আশ্রয় পাইবেন। পতি-পরিত্যক্তা অভাগিনী দময়ন্তী কয়েকদিন অনাথিনীর ন্যায় ভ্রমণ করিতে করিতে একদিন দেখিলেন যে বহু অশ্ব ও হস্তীবাহিত দ্রব্যসম্ভার সহ এক বিরাট বণিকদল (মহাসার্থ) নদী পার হইতেছে। এই বর্ণনা হইতে মহাভারতের যুগে হস্তী ও অশ্বপৃষ্ঠে বিপণি সম্ভার লইয়া দেশে দেশে দলবদ্ধভাবে বণিককুল বা সার্থবাহের পরিভ্রমণ বিশেষভাবে লক্ষণীয়। দময়ন্তী-দৃষ্ট এই সার্থবাহের গন্তব্যস্থল ছিল চেদি রাজ্যের রাজধানী (বুন্দেলখণ্ড অঞ্চল)। দময়ন্তী সার্থবাহ দলের সহিত চেদি রাজ্যে উপস্থিত হইয়া তথাকার রাজমাতার আশ্রয় প্রাপ্ত হন। রাজমাতার চেষ্টায় দময়ন্তী পিতৃগৃহ বিদর্ভরাজ্যে গমন করেন (বনপর্ব, ৬৩-৬৯)।

মহাভারতে বর্ণিত কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে সমগ্র ভারতের রাজন্যবৃন্দ অংশ গ্রহণ করেন। ভারতের পূর্বতম প্রান্তের (প্রাগ্‌জ্যোতিষ) নরপতি ভগদত্ত বিশাল হস্তি-বাহিনী সহ কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে যোগদান করিয়াছিলেন। অতুল পরাক্রম প্রকাশ করিয়া তিনি এই যুদ্ধে দুর্যোধনের পক্ষ লইয়া মৃত্যুবরণ করেন।

আসাম হইতে কুরুক্ষেত্র পর্যন্ত (বর্তমান হরিয়ানা রাজ্য) সুপ্রশস্ত পথ না থাকিলে ভগদত্তের পক্ষে ঐ স্থানে হস্তিবাহিনীসহ যুদ্ধার্থ আগমন সম্ভব হইত না।

পণ্ডিতপ্রবর গোল্ডষ্ট্যুকর ও অধ্যাপক রামকৃষ্ণ ভাণ্ডারকরের মতে পাণিনির জন্ম খৃষ্টপূর্ব সপ্তম শতাব্দীরও পূর্বে। ম্যাকডোনেলের মতে পাণিনি খৃষ্টপূর্ব পঞ্চম হইতে চতুর্থ শতাব্দীর মধ্যে তাঁহার অষ্টাধ্যায়ী ব্যাকরণ রচনা করেন। পাণিনির ব্যাকরণে ভারতবর্ষের ২২টি জনপদ বা রাষ্ট্রের উল্লেখ আছে। ক্রয় বিক্রয়, ব্যবসাবাণিজ্যের ও পণ্যের উল্লেখ দেখা যায়। (২, ৩, ৫৭ ; ৪, ৪, ৫১ ; ৩, ৩, ৫২ ; ৪, ২, ১,) এক নগর হইতে অন্য নগরগামী পথ এবং এই পথের সুনির্দিষ্ট বিভাগ থাকারও উল্লেখ আছে (৪, ৩, ৮৫ ; ৩, ৩, ১৩৬)। (১)

(১) Astadhayi of Panini (1-8)—Tr. into English by Sris Chandra Vasu, 1897.

অষ্টাধ্যায়ীর একটি সূত্রে (দেবপথাদিভ্যশ্চ—দেবপথাদিগণ, ৫, ৩, ১০০) বারিপথ (জলপথ) ও স্থলপথ এবং স্থলপথের অন্তর্গত রথপথ (রথবহন-যোগ্য পথ), করিপথ (হস্তী গমনযোগ্য পথ), অজপথ (যে পথে শুধু ছাগ যাইতে পারে এমন সঙ্কীর্ণ) ও রাজপথ প্রভৃতির উল্লেখ আছে।

অষ্টাধ্যায়ীর একটি সূত্রে উত্তরাপথের উল্লেখ আছে, (উত্তর পথেনাহৃতং—৫, ১, ৭৭)। উত্তরাপথে আহৃত ও উত্তরাপথগামীদের—উত্তর পথিক বলা হইয়াছে। পাণিনি লিখিত এই উত্তরাপথ গান্ধার হইতে পূর্বদিকে তাম্রলিপ্ত পর্যন্ত সম্ভবত বিস্তৃত ছিল। আর্য ভারতের সীমা অতিক্রম করিয়া উত্তরাপথ পশ্চিম দিকে অক্সাস নদী ও কাস্পিয়ান সাগর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল (১)।

পাণিনি বর্ণিত উত্তরাপথের আলোচনা পরে আরও করা হইবে।

পাণিনির টীকাকার কাত্যায়ন (আনুমানিক খৃঃ পূঃ ৩৫০ অব্দ) কৌশাম্বী (এলাহাবাদের নিকটবর্তী কোশাম গ্রাম) হইতে বিন্ধ্যারণ্যের মধ্য দিয়া পৈঠান (গোদাবরী নদীর উত্তর তীরবর্তী জনপদ) ও ভারুকচ্ছ (গুজরাতের অন্তর্বর্তী আধুনিক বরোচ্) পর্যন্ত বিস্তৃত একটি কান্তার-পথের উল্লেখ করিয়াছেন।

পাণিনির অপর এক টীকাকার পতঞ্জলির মহাভাষ্যে কান্তার-পথিক, বারি-পথিক, স্থল-পথিক প্রভৃতির উল্লেখ আছে (১, ১, ৪৯)। শকট বহনযোগ্য পথকে রথ্যা বলা হইয়াছে (৫, ১, ৭৭)। পতঞ্জলি সম্ভবতঃ ১৫০ খৃঃ পূর্ব অব্দে বর্তমান ছিলেন।

প্রচলিত স্মৃতিশাস্ত্রগুলি রামায়ণ, মহাভারত ও পাণিনির পরবর্তী যুগের রচনা। মনুস্মৃতিতে লিখিত আছে, বাণিজ্য পথগুলি গভীর বন ও জলাভূমির মধ্য দিয়া গিয়াছে (৭, ১৮৫)। এই যুগে মানুষ, পশু ও চক্রযুক্ত শকটের সাহায্যে বাণিজ্যিক দ্রব্য বাহিত হইত (৮, ৪০৫)। এই সব সুনির্দিষ্ট বাণিজ্যপথের ধারে স্থানে স্থানে শুল্ক সংগ্রহের ঘাঁটি থাকিত; এখানে রাজকীয় কর্মচারিগণ সাহায্যে বণিকদের দেয় শুল্ক আদায় করিত। পথের মধ্যে নদী থাকিলে উহা নৌকায় পার হইতে হইত, এই পারাপার ব্যবস্থা ছিল রাজার, এজন্য বণিক্‌দের পৃথক শুল্ক দিতে হইত না। ঘাঁটি গুলিতে বাহিত বস্তুর পরিমাণ ও গুণাগুণ পরীক্ষা করিয়া লওয়া হইত (২)।

---

(১) "Strabo speaking of the Oxus states that it formed an important link in an important chain along which Indian goods were carried to Europe by way of Caspian and Black Seas...This makes it clear that the route was a popular one early in 3rd. century B C."—Cambridge History of India (Vol. I.) P. 433.

(২) J. Jolly.—Manava Dharma Sastra, London, 1893.

পঞ্চম অধ্যায়

প্রাচীন বৌদ্ধসাহিত্যের পথ পরিচয়

খ্রীঃ পূঃ ৫৬৩ অব্দে ভগবান বুদ্ধ হিমালয়ের পাদদেশে শাক্যরাজধানী কপিলবস্তুর নিকট লুম্বিনী নামক স্থানে শাক্যরাজ-বংশে জন্মগ্রহণ করেন। জন্মকালে তাঁহার নাম ছিল সিদ্ধার্থ। উত্তরকালে তিনি বুদ্ধদেব নামে খ্যাত হন। ৬২৩ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দে বুদ্ধের জন্ম হয় এইরূপ একটি দ্বিতীয় মতও অবশ্য প্রচারিত আছে। লুম্বিনী স্থানটি ভারতসীমান্তে বর্তমান নেপালের ভৈরহাওয়া জেলায় অবস্থিত এবং বর্তমানে রুম্মিনদেই নামে পরিচিত। এখানে বুদ্ধদেবের জন্মস্থান রূপে চিহ্নিত সম্রাট অশোক প্রতিষ্ঠিত একটি স্তম্ভ আছে।

পূর্বোত্তর রেলপথের নৌতুনোয়া স্টেশন হইতে এই স্থানটির দূরত্ব পূর্বদিকে মাত্র দশ মাইল। বুদ্ধদেবের জীবদ্দশাতেই কোশলরাজ বিরুধক কপিলবস্তু নগরটি ধ্বংস করেন। কপিলবস্তু হইতে গর্ভাবস্থায় শাক্যরাজমহিষী মায়াদেবীর পিতৃগৃহ দেবদহে গমন কালে মধ্যপথে লুম্বিনীকাননে বুদ্ধদেব ভূমিষ্ঠ হন—, সুতরাং কপিলবস্তু লুম্বিনী হইতে অধিক দূরবর্তী ছিল না বলিয়া পণ্ডিতেরা অনুমান করিয়া থাকেন।

কোন কোন পণ্ডিতের মতে রুম্মিনদেই-এর উত্তর পশ্চিমে ১৫ মাইল দূরে নেপাল তরাইএ অবস্থিত তিলৌরাকোট নামক স্থানে কপিলবস্তু অবস্থিত ছিল। আবার কোন কোন পণ্ডিতের মতে উত্তর প্রদেশের বস্তি জেলার পিপরাওয়া নামক স্থানে কপিলবস্তু অবস্থিত ছিল। রুম্মিনদেই হইতে এই স্থানটি প্রায় ৯ মাইল পশ্চিমে অবস্থিত। পিপ্‌রাওয়ায় বৌদ্ধযুগের বহু প্রত্ন-নিদর্শন ও কয়েকটি ছাপ (seal) পাওয়া গিয়াছে। রুম্মিনদেই হইতে নাতিদূরে অবস্থিত এই স্থানেই কপিলবস্তু অবস্থিত ছিল বর্তমানে প্রত্নবিদেরা এইমত পোষণ করেন।

বুদ্ধের আবির্ভাব ভারতের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনে এক নূতন অধ্যায়ের সূচনা করিয়াছিল। বুদ্ধের সময়ে চম্পা (বিহার রাজ্যের ভাগলপুর অঞ্চল), রাজগৃহ (বিহার রাজ্যের রাজগীর), বৈশালী (বিহার রাজ্যের মজঃফরপুরের নিকট বসার), শ্রাবস্তী (উত্তর প্রদেশের বলরামপুর স্টেশনের নিকট সাহেত মাহেত), সাকেত (উত্তর প্রদেশ, অযোধ্যার নামান্তর),

কাশী, কৌশাম্বী (এলাহাবাদের নিকট কোশাম), মথুরা, উজ্জয়িনী (মধ্যপ্রদেশ) প্রভৃতি প্রসিদ্ধ নগর ছিল। বৌদ্ধ যুগের ষোলটি মহাজন-পদ বা দেশের নাম :—অঙ্গ, মগধ, কাশী, কোশল, বৃজ্জি, মল্ল, চেদি, বংশ (বাৎস্য), কুরু, পাঞ্চাল, মৎস্য, সুরসেন, অশ্বক, অবন্তী, গান্ধার ও কম্বোজ।

ইহা ব্যতীত এই সময়ে ১১টি গণতন্ত্রী রাষ্ট্র ছিল (১)। বুদ্ধ এইরূপ একটি গণতন্ত্রী শাক্যকুলে জন্মগ্রহণ করেন। অপর রাষ্ট্রগুলির মধ্যে বৃজ্জি ও লিচ্ছবি রাষ্ট্রও বিশেষ শক্তিশালী ছিল। লিচ্ছবিদের রাজধানী ছিল বৈশালী। জৈন তীর্থঙ্কর মহাবীর বৈশালীর উপকণ্ঠে বুদ্ধের সমসাময়িক কালে জন্মগ্রহণ করেন।

প্রায় ২৯ বৎসর বয়সের সময় রাজকুমার সিদ্ধার্থ গৃহত্যাগ করিয়া কপিলবস্তু হইতে রাজগীর (মহাভারতীয় যুগের গিরিব্রজ) ও তথা হইতে রাজর্ষি গয়ের নগরী বা গয়া গমন করেন। এখানে তিনি নিরঞ্জনা (ফল্গু) নদী তীরে তপস্যায় মগ্ন হইলেন। প্রায় ছয় বৎসর কঠোর তপস্যার পর বোধিলাভ করিয়া তিনি পুণ্যধাম বারাণসীতে আগমন করেন। ৩৫ বৎসর বয়সে বোধিলাভ করার পর বুদ্ধদেব আরও পঁয়তাল্লিশ বৎসর জীবিত ছিলেন। এই সময়ের মধ্যে বৈশালী, পাটলিপুত্র, (পাটলিগ্রাম) রাজগৃহ, শ্রাবস্তী কৌশাম্বী প্রভৃতি স্থানে তাঁহাকে উপদেশ দান রত দেখিতে পাওয়া যায়।

বুদ্ধের অন্তিম যাত্রার পথের আলোচনা করিলে দেখা যায়, উনআশী বৎসর বয়সে তিনি রাজগৃহ, নালন্দা, পাটলিগ্রাম (পরে পাটলিপুত্র নামে খ্যাত) কোটিগ্রাম, নদীকাগ্রাম হইয়া বৈশালী আগমন করেন।

বৈশালী (মজঃফরপুরের নিকট বসার গ্রাম) হইতে ভাণ্ডগ্রাম, হত্থিগাম, আম্বগাম, ভোগনগর হইয়া তিনি পাবা আগমন করেন। পাবার বর্তমান নাম পপটর, ইহা উত্তর প্রদেশের দেওরিয়া জেলার পড্রৌনা তশীলের অন্তর্ভুক্ত। ইহা বুদ্ধের সময়ে মল্লরাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত ছিল। এখানে কোন ভক্তপ্রদত্ত আহার্য গ্রহণ করিয়া বুদ্ধ রক্তামাশয় রোগে আক্রান্ত হন। তথায় মৃত্যু হইলে সকলে ঐ ভক্তপ্রদত্ত খাদ্য তাঁহার পীড়া ও মৃত্যুর কারণ মনে করিবে ও ভক্ত সাতিশয় মনোবেদনা পাইবে অনুমান করিয়া করুণাময় বুদ্ধ অতি দুর্বল শরীরেও সত্বর সেই স্থান ত্যাগ করিয়া কুশীনারা যাত্রা করেন। (২) হিরণ্যবতী নদী পার হইয়া অবসন্ন দেহে তিনি কুশীনারা বা

(১) Rhys Davids—Buddhist India, (Chap II)
(২) মহাপরিনির্বাণ সুত্তান্ত (১-৫ অঃ) (SBE XI) P. 103

কুশীনগর পৌঁছিলেন। শালবীথিকায় উপবেশন করিয়া তিনি শিষ্য ও সহচর আনন্দকে শয্যা রচনা করিতে বলিলেন। নিকটস্থ মল্লদের সংবাদ পাঠান হইল—তথাগতের অন্তিম কাল সমাগত। উপস্থিত মল্ল ও ভক্তদের ধর্মোপদেশ দিতে দিতে প্রায় ৮০ বৎসর বয়সে শাক্যমুনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। কুশীনারা বর্তমানে কাসিয়া নামে পরিচিত। পূর্বোত্তর রেলওয়ের গোরক্ষপুর স্টেশন হইতে কাসিয়া উত্তর পূর্বকোণে ৩৪ মাইল দূরে অবস্থিত।

বুদ্ধের সমকালীন ও তাঁহার পরবর্তীকালের পথ ঘাটের বহু বিবরণ প্রাচীন বৌদ্ধ সাহিত্যে পাওয়া যায়। এইগুলি প্রধানতঃ পালি ভাষায় লিখিত।

বিনয় পিটক (১) গ্রন্থে নিম্নলিখিত পথগুলির উল্লেখ আছে :—

(ক) রাজগৃহ হইতে তক্ষশিলা :—বারবধূ শালবতীর গর্ভজাত ও মগধ রাজপুত্র অভয়ের প্রতিপালিত জীবক এই পথে অধ্যয়ন করিতে তক্ষশিলা গমন করেন (বিনয়, মহাবগ্‌গ ৮।১।৬)।

(খ) তক্ষশিলা—সাকেত (অযোধ্যা)—রাজগৃহ :—তক্ষশিলায় শিক্ষালাভান্তে জীবক সাকেত নগরে আসেন এবং তথা হইতে অশ্ব শকটে রাজগৃহ প্রত্যাবর্তন করেন। মনে হয় এই পথেই তিনি তক্ষশিলা যান। রাজগৃহ হইতে তক্ষশিলা পথের দৈর্ঘ ছিল ১৯২ যোজন (বিনয়, মহাবগ্‌গ, ৮।১।১৪)।

(গ) রাজগৃহ—বারাণসী। মগধের রাজবৈদ্যরূপে জীবক মহারাজ বিম্বিসারের আদেশে এক শ্রেষ্ঠিপুত্রের চিকিৎসার জন্য এই পথে রাজগৃহ হইতে বারাণসী গমন করেন (বিনয়, মহাবগ্‌গ, ৮।১।২২)।

(ঘ) রাজগৃহ—উজ্জয়িনী। বিম্বিসারের অনুমতিক্রমে জীবক অবন্তীরাজ প্রদ্যোতের চিকিৎসার্থ এই পথে উজ্জয়িনী গমন করেন ও কৌশাম্বী (এলাহাবাদের নিকট কোশাম) হইয়া প্রত্যাবর্তন করেন (বিনয়, মহাবগ্‌গ ৮.১।২৮)।

(ঙ) অনুপীয় (কপিলবস্তুর পূর্বে, কপিলবস্তু ও রাজগৃহের মধ্যবর্তী মল্ল-রাষ্ট্রভুক্ত স্থান)—কৌশাম্বী। এই পথে একবার বুদ্ধ স্বয়ং ভ্রমণ করেন (বিনয়, চুল্লবগ্‌গ ৭।২।১)।

(চ) শ্রাবস্তী (উত্তরপ্রদেশের গোণ্ডা-বাহারাইচ জেলার সীমান্তে সাহেত-মাহেত)—আলভী (আটবী)। এই পথে বুদ্ধ একবার ভ্রমণ করেন (বিনয়, চুল্লবগ্‌গ ৬।১৬।১, ৬।১৭।১)।

---

(১) Oldenburg H. (Ed.)—Vinaya Pitaka

(ছ) সোরীয় (বর্তমান উত্তরপ্রদেশে বদায়ুঁর নিকট সোরোঁ নামক স্থান ; এখানে পূর্বোত্তর রেলের এই নামে একটি স্টেশন আছে)—সঙ্কিসা (উত্তর প্রদেশের ফারুখাবাদ জেলায়)—কান্যকুব্জ (কনৌজ)—সহজাতি (এলাহাবাদের নিকট ভিটা) : এই পথে বৌদ্ধাচার্য রেবতের ভ্রমণ বর্ণিত হইয়াছে। বৈশালীর ভিক্ষুগণ সোরীয়তে রেবতের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যান, কিন্তু সেখানে গিয়া তাঁহারা জানিতে পারেন যে, আচার্য রেবত অন্যত্র গমন করিয়াছেন। সোরীয়, সঙ্কিসা, কান্যকুব্জ হইয়া তাঁহারা সহজাতি আগমন করিয়া রেবতের সন্ধান পান—(বিনয়, ১২।১।১০ চুল্লবগ্‌গ)।

(জ) আলভী (আটবী)—রাজগৃহ : আলভী-রাজগৃহ পথে একাধিকবার বুদ্ধের ভ্রমণ বর্ণিত হইয়াছে।—(বিনয়, চুল্লবগ্‌গ, ৬।১৬।১, ৬।১৭।১, ৬।২১।১)। কানিংহাম ও হোয়েরন্‌লের মতে বর্তমান উত্তর প্রদেশের উন্নাও জেলার নেওয়াল বা নেওয়াল নগর নামক স্থানে আলভী অবস্থিত ছিল। অন্যদের মতে ইটাওয়া শহরের ২৭ মাইল দূরে উত্তর-পূর্ব কোণে অবস্থিত আভিওয়া স্থানটি ছিল প্রাচীন আলভী (১)।

(ঝ) বেরঞ্জা—সোরীয়—সঙ্কিসা—কান্যকুব্জ—বারাণসী : এই পথে বুদ্ধের ভ্রমণ বর্ণিত হইয়াছে (বিনয়, সুত্র বিভাগাঙ্গ, পরাজিক ১।৪)। বেরঞ্জার অবস্থিতি নির্ণয় করা কঠিন। সম্ভবতঃ বদাঁয়ু জেলার বর্তমান সোরোঁর (সোরীয়) পশ্চিম বা উত্তর দিকে কিছুদূরে ইহা অবস্থিত ছিল। বেরঞ্জা হইতে সরাসরি একটি পথে মথুরা যাওয়া চলিত। সঙ্কিসা বর্তমান উত্তর প্রদেশের ফারুখাবাদ জেলায় মোটা রেলওয়ে স্টেশনের চার মাইল দূরে উত্তর-পূর্ব কোণে অবস্থিত।

(ঞ) সাকেত-শ্রাবস্তী : (এই পথটি অবশ্যই একটি মহাপথের অংশ ছিল)। এই ছয় যোজন দীর্ঘ পথে দস্যুর উপদ্রব ছিল (বিনয়, মহাবগ্‌গ, ১।৬৬।১-২, ১।৬৭।১)।

(ট) রাজগৃহ—পাটলিপুত্র (পাটলিগ্রাম)—কোটিগ্রাম—নটিকা (নদীকা), —বৈশালী (বসার) :—এই পথে বুদ্ধের যাতায়াতের উল্লেখ আছে (বিনয়, মহাবগ্‌গ, ৬।২৮-৩২)।

(ঠ) গয়া—উৎকল (ওড়িশা) : উৎকল হইতে তপুস ও ভল্লিক নামে দুই বণিকের সহিত বুদ্ধের সাক্ষাৎ হয়। বুদ্ধ তাহাদের ধর্মোপদেশ দান

(১) G. P. Malalasekar—D. P. P. N., pp. 229-230.

করেন। বুদ্ধত্ব লাভের পর এই দুই বণিকই সর্বপ্রথম বুদ্ধের উপদেশ লাভ করেন। এই ঘটনা হইতে উৎকল হইতে গয়াগামী একটি পথের অস্তিত্ব জানা যাইতেছে (বিনয়, মহাবগ্‌গ, ১।৪।২১)।

জাতকে নিম্নবর্ণিত অনেকগুলি পথের উল্লেখ আছে (১)।

(ক) শ্রাবস্তী—সীমান্ত অঞ্চল (সম্ভবতঃ গান্ধার রাজ্যের তক্ষশিলা)। এই পথে অনাথপিণ্ডিকের 'সার্থবাহ' পুনঃ পুনঃ যাতায়াতের উল্লেখ দেখা যায় (No. 90, Vol. I, p. 220)।

(খ) বারাণসী—শ্রাবস্তী (No. 55, Vol. I, p. 137 ; No. 61, Vol. I, p. 148 ; No. 96, Vol. I, p 233 ; No. 130, Vol. I, p. 285)

(গ) তক্ষশিলা হইতে অন্ধ্রদেশ হইয়া বারাণসী। কোন এক জন্মে বুদ্ধের এই পথে ভ্রমণ বর্ণিত হইয়াছে (No. 80, Vol. I, p. 203)।

(ঘ) কুশীনগর (কাসিয়া, উত্তর প্রদেশের দেওরিয়া জেলা)—শাকল (পাঞ্জাবের শিয়ালকোট অঞ্চল)। কুশাবতীরাজ ওখ্‌খক (ইক্ষাকু) প্রচুর লোকজন সহ কুশীনগর হইতে মদ্র রাজধানী শাকল গমন করেন। এই পথ ১০০ যোজন দীর্ঘ ছিল। সম্ভবতঃ এই পথের উপরই হস্তিনাপুর অবস্থিত ছিল (No. 531, Vol. V, p. 146)।

(ঙ) বারাণসী—উজ্জয়িনী। গুত্তিল জাতকে বারাণসী হইতে ব্যবসায়ের জন্য বণিকদের উজ্জয়িনী যাতায়াতের উল্লেখ আছে (No. 243, Vol. II, p. 172)।

(চ) বিদেহ (উত্তর বিহার) হইতে গান্ধার (তক্ষশিলা অঞ্চল)। বুদ্ধ কোন এক জন্মে বিদেহ-রাজপুত্র রূপে জন্মগ্রহণ করেন। বিদেহ হইতে তক্ষশিলায় গিয়া তিনি শিক্ষা লাভ করেন (No. 160, Vol. II, P. 27)। বিদেহের বণিকদের বাণিজ্যার্থে তক্ষশিলায় গমনের উল্লেখ আছে (No. 406, Vol. III, p. 222)।

(ছ) বারাণসী—রাজগৃহ। দরীমুখ জাতকে এক রাজপুত্রের রাজপুরোহিত সহ রাজগৃহ হইতে বারাণসী আগমন বর্ণিত হইয়াছে (No. 378, Vol. III, p. 156)। এই পথে পিলীয় নামক শ্রেষ্ঠীর ভ্রমণও বর্ণিত হইয়াছে (No. 131, Vol. I, p. 286.)।

---

(১) Jatakas—Tr, by Cowell and others (Vol. 1-6), 1895-'97.

(জ) ইন্দ্রপ্রস্থ (দিল্লী)—তক্ষশিলা। মহাসুতসোম জাতকে সুতসোমের ইন্দ্রপ্রস্থ হইতে তক্ষশিলা গমন বর্ণিত হইয়াছে (No. 537, Vol. V, p. 246)।

(ঝ) ভড্ডিয় (ভদ্রিকা)—শ্রাবস্তী। ভড্ডিয় চম্পারাজ্যের চম্পানগরের নিকট অবস্থিত ছিল। মহাপদ্ম জাতকে বুদ্ধের শ্রাবস্তী হইতে ভড্ডিয় আগমন ও তথায় একটি বিহারে তিনমাস অবস্থানের উল্লেখ আছে (No. 264, Vol. II, p. 229)।

(ঞ) বেরঞ্জা—শ্রাবস্তী। খুল্লশুক জাতকে বেরঞ্জা হইতে একবার বুদ্ধের শ্রাবস্তী আগমনের উল্লেখ আছে (No. 430, Vol. III, p. 294)।

(ট) দন্তপুর (কলিঙ্গ রাজধানী)—ইন্দ্রপ্রস্থ (দিল্লী)। কুরুধর্ম জাতকে দন্তপুর হইতে আটজন ব্রাহ্মণের ইন্দ্রপ্রস্থ যাতায়াত বর্ণিত হইয়াছে (No. 276, Vol, II, p, 254)।

(ঠ) দন্তপুর—পোতালি (অশ্বক রাজ্যের রাজধানী—নামান্তর পোটানা, বর্তমান নাম বোধন, অন্ধ্র প্রদেশের নিজামাবাদ জেলায়)। খুল্ল কলিঙ্গ জাতকে কলিঙ্গ রাজ্য হইতে নানা দেশ ঘুরিয়া কলিঙ্গ রাজকন্যাদের পোতালি গমন বর্ণিত হইয়াছে (No. 301, Vol. III, p. 2)।

ধম্মপদ অট্ঠকথায় (১) নিম্নলিখিত পথের উল্লেখ আছে—

(ক) সেতব্য (পূর্বোত্তর রেলপথের নেপালগঞ্জ স্টেশনের নিকট বালাপুর গ্রাম)—শ্রাবস্তী (pt.I, p. 184, H.O.S, V. 28)। চুল্ল ও মহাকাল নামে দুই বণিক্ ভ্রাতার এই পথে যাতায়াতের উল্লেখ আছে।

(খ) বারাণসী—তক্ষশিলা। গর্দভ পৃষ্ঠে মাটির বাসন লইয়া এক বণিকের বারাণসী হইতে তক্ষশিলা গমনের উল্লেখ আছে (pt.I, p. 224, Vol. 28)।

(গ) সোরীয় (উত্তর প্রদেশের সোরোঁ)—তক্ষশিলা। এই পথে সার্থবাহের যাতায়াত বর্ণিত হইয়াছে (pt. II, Vol. 29, p. 24-25)

(ঘ) ভড্ডিয় (অঙ্গ রাজ্যে চম্পার নিকট)—রাজগৃহ—সাকেত (অযোধ্যা)—শ্রাবস্তী (সাহেত মাহেত)। ভড্ডিয় হইতে শ্রেষ্ঠী ধনঞ্জয়ের কন্যা বিশাখা এই পথে শ্রাবস্তী গমন করেন। উত্তর কালে এই বিশাখা বুদ্ধের একজন প্রধানা

(১) Dhammapada Attakatha (Buddhist Legends)—Harvard Oriental Series (Vol. 28-30, Pts. 1-3).

শিষ্যা হন। বিশাখার ভগ্নী সুজাতা শ্রাবস্তীবাসী বুদ্ধশিষ্য অনাথ পিণ্ডিকের পুত্রবধূ ছিলেন (pt. II, Vol. 29, p. 26.)।

(৬) আলভী (আটবী)—শ্রাবস্তী। শ্রাবস্তী হইতে আলভীর দূরত্ব ৩৫ যোজন উল্লিখিত হইয়াছে। বুদ্ধ একাধিকবার এই পথে ভ্রমণ করেন (pt. III, Vol. 20, p. 16)।

সুত্তনিপাত গ্রন্থে নিম্নবর্ণিত দীর্ঘ পথের উল্লেখ আছে। বাভরী নামক এক ব্রাহ্মণ কোশল হইতে অশ্বক দেশে গিয়া বাস করিতেন। এই ব্রাহ্মণের ষোলজন শিষ্য অশ্বক দেশের গোদাবরী তীর হইতে পৈঠান (মহারাষ্ট্রের ঔরঙ্গাবাদ জেলায়), মাহিষ্মতী (ইন্দোরের দক্ষিণে নর্মদা তীরে নিমার অঞ্চল), উজ্জয়িনী, গোনর্দ্ধ, বিদিশা (ভিল্সার নিকট বেসনগর), বনসাভ্য (সম্ভবতঃ বর্তমান তুমেন, গুনা জেলায়), কৌশাম্বী (কোশাম), সাকেত (অযোধ্যা), শ্রাবস্তী (সাহেতমাহেত), সেতব্য (বালাপুর), কপিলবস্তু (আধুনিক ম্মিনদেই-এর নিকট), কুশীনগর (দেওরিয়া জেলায়), পাবা (বর্তমান পপটর, দেওরিয়া জেলার পড্রৌনা তশীল), বৈশালী (মজঃফরপুরের নিকট বসার গ্রাম), পাটলিপুত্র (পাটলীগ্রাম) নালন্দা প্রভৃতি স্থান হইয়া রাজগৃহে আসিয়া বুদ্ধের দর্শন লাভ করেন (সুত্তনিপাত, শ্লোক ৯৭৬—৯৭৭, ১০১১—১০১৪) (১)।

মজ্ঝিম নিকায় (২) হইতে এই পথগুলির অস্তিত্ব জানা যায়: (ক) শ্রাবস্তী—রাজগৃহ (খ) শ্রাবস্তী—উজ্জয়িনী—মাহিষ্মতী—পৈঠান, —ভারুকচ্ছ (গুজরাতের আধুনিক বরোচ্)—সূর্পারক (আধুনিক সোপারা)।

অঙ্গুত্তরনিকায় গ্রন্থে (৩) নিম্নলিখিত পথগুলির উল্লেখ আছে (ক) মথুরা—বেরঞ্জা (খ) বেরঞ্জা—ইন্দ্রপ্রস্থ। সম্ভবতঃ এই পথটি বর্তমান বুলন্দশরের পার্শ্ব দিয়া যাইত।

দীঘ্ঘ নিকায় হইতে জানা যায় যে বৈশালী (বসার) হইতে রাজগৃহ (রাজগীর) পথটি নটীকা, কোটিগ্রাম, পাটলিগ্রাম (পাটলিপুত্র) নালন্দা ও

(১) Suttanipata, S.B.E., Vol. X.

(২) Majjhim Nikaya, Pali Text Society, London, 1882-1901, Vol. I, p 2.

(৩) Angutta Nikaya—Pali Text Society, London, 1885-1903, Vol. I p. 65, Vol. II, p. 27

আম্বলাঠ্ঠিকের মধ্য দিয়া প্রসারিত ছিল (১)। এই পথে ভ্রমণ করিতে হইলে পাটলিপুত্রের নিকট গঙ্গা নদী পার হইতে হইত।

মিলিন্দপন্‌হ (২) গ্রন্থে দেখা যায় যে হিমালয় পর্বতের পাদমূলে অবস্থিত উত্তর-পশ্চিম অঞ্চল হইতে পাটলিপুত্র পর্যন্ত ১০০ যোজন (league) দীর্ঘ একটি পথ ছিল। পাটলিপুত্র হইতে ধর্মরক্ষিত নামে এক বণিক্ পাঁচশত শকট লইয়া ঐ স্থানে বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে গিয়াছিলেন। এই স্থান হইতে প্রত্যাবর্তনের পথে নাগসেন নামে একজন বৌদ্ধ সন্ন্যাসী তাঁহার সঙ্গীরূপে পাটলিপুত্রে আগমন করেন। (১।৩১-৩৪, পৃঃ ২৭-২৮) বিমানবথ্থু গ্রন্থে লিখিত হইয়াছে যে চম্পার বণিকগণ শ্রেণীবদ্ধভাবে বারাণসী, কৌশাম্বী ও মথুরা হইয়া সিন্ধু সৌবীর দেশের রাজধানী রোরুক পর্যন্ত বাণিজ্য করিতে যাইত। মথুরা হইতে রোরুক-গামী দুইটি পথ ছিল। একটি দ্বারাবতী বা দ্বারকার মধ্য দিয়া ছিল। অপর পথটি ছিল মথুরা-ইন্দ্রপ্রস্থ-রোহিতক (বর্তমান রোটাস্)—অতঃপর শতদ্রু উপত্যকার শিবি হইয়া রোরুক। দ্বারাবতী হইয়া প্রথমোক্ত পথটি কম্বোজ দেশের মধ্য দিয়া বাহ্লীকের (ব্যাক্‌টিয়ার) সহিত যোগাযোগ রক্ষা করিত। চম্পা-সিন্ধু—সৌবীর বাণিজ্য সম্পর্কের ফলে চম্পার বণিকেরা প্রচুর ধন উপার্জন করিত; মগধের বণিকেরাও চম্পার বণিকদের 'সার্থবাহ' দলে যোগদান করিত (৩)।

প্রাচীন বৌদ্ধ সাহিত্যের উপরিলিখিত পথ-বিবরণ হইতে দেখা যায় যে ইহাতে দূরগামী ও আঞ্চলিক এই উভয়বিধ পথই উল্লিখিত হইয়াছে। যে আঞ্চলিক পথগুলির উল্লেখ আছে সেগুলি বহু ক্ষেত্রে একটি দীর্ঘ পথের খণ্ডাংশ। মহাপথগুলির বিবরণ বিভিন্ন ক্ষেত্রে একরূপই দেওয়া হইয়াছে। আলোচিত বিবরণগুলি হইতে মোটামুটি নিম্নলিখিত চারিটি দীর্ঘ বা মহাপথের বিবরণ পাওয়া যায়।

---

(১) Digha Nikaya, Pali Text Society, London, 1896-1911, (Vol. II, p. 17).

(২) Milindapanha (Questions of Milinda)—Sacred Books of the east, Vols. 35-36.

(৩) Vimanbatthu Attakatha, Ed. by E. R. Gooneratne, Pali Text Society, London, 1886, p. 78.

(১) কোশলের রাজধানী শ্রাবস্তী (আধুনিক সাহেত-মাহেত) হইতে পূর্ব-দক্ষিণ মুখে রাজগৃহ মহাপথ—এই পথে সেতব্য, কুশীনগর-পাবা-বৈশালী-পাটলিগ্রাম (পাটলিপুত্র), নালন্দা ও মগধের রাজধানী রাজগৃহ (বর্তমান বিহার রাজ্যের রাজগীর) অবস্থিত ছিল। সম্ভবতঃ নদীপথের বাধা এড়াইতে এই পথটি হিমালয়ের পাদমূল হইয়া ঘুরাইয়া লওয়া হইয়াছিল। এই প্রায় তিনশত মাইল দীর্ঘ পথে বারটি বিশ্রাম স্থান ছিল। এই পথে পাটলিপুত্রে একবার মাত্র নদী পার হইতে হইত।

(২) শ্রাবস্তী হইতে দক্ষিণ-পশ্চিম মুখে সাকেত (অযোধ্যা), কৌশাম্বী (এলাহাবাদের নিকট কোশাম), বিদিশা (বেসনগর ভিল্‌সা), উজ্জয়িনী, মাহিষ্মতী (ইন্দোরের ৪০ মাইল দক্ষিণে) হইয়া গোদাবরীর উত্তর তীরে অবস্থিত পৈঠান (প্রতিষ্ঠান) পর্যন্ত মহাপথ—এই পথে ছয়টি ঘাঁটি বা বিশ্রাম স্থান ছিল। এই পথে একবার গঙ্গা ও একবার যমুনা পার হইতে হইত।

(৩) রাজগৃহ-বারাণসী-সাকেত-শ্রাবস্তী হইতে কৌশাম্বী-মথুরা-রোহিতক হইয়া তক্ষশিলা পর্যন্ত মহাপথ।

(৪) রাজগৃহ—শ্রাবস্তী হইয়া সিন্ধু সৌবীর দেশের রাজধানী রোরুক পর্যন্ত মহাপথ (১)। বহুতর স্থানীয় পথ এই পথগুলির সহিত মিলিত হইত। রাজগৃহগামী পথটি দিয়া গয়া যাওয়া চলিত। সমুদ্রতীরবর্তী তাম্রলিপ্ত হইতে বারাণসীগামী পথটি কোন একস্থানে রাজগৃহ-গয়াগামী পথের সহিত মিলিত হইত (২)। মহাবস্তু (৩) হইতে জানা যায় যে বুদ্ধ বোধি লাভান্তর সর্বপ্রথম গয়া হইতে বারাণসী গমন করেন। নৈরঞ্জনা (ফল্গু) তীরবর্তী উরুবিল্ব (বুদ্ধগয়া) হইতে গয়া, অপর গয়া, বসালা, চুন্দবিল্ল, লোহিত বস্তুক, গন্ধপুর, হইয়া তিনি সারথিপুর পৌছেন। এইস্থানে গঙ্গা পার হইয়া তিনি অপর পারে বারাণসী পৌছেন (৩)। মগধ রাজধানী রাজগৃহের পূর্বদিকে তিনটি প্রধান বাণিজ্য কেন্দ্র ছিল ভড্ডিয় (ভদ্রিকা), চম্পা (ভাগলপুরের ২৪ মাইল পূর্বে) ও তাম্রলিপ্ত (পশ্চিমবঙ্গের মেদিনীপুর জেলার তমলুক শহর)। চম্পা ছিল প্রাচীন অঙ্গরাজ্যের রাজধানী।

---

(১) B.C. Law—India as described in Early texts of Buddhism, p. 70.

(২) Rhys Davids—Buddhist India, p. 103.

(৩) The Mahavatthu—Tr. J. J. Jones (Sacred Books of the Buddhists), Vol. III, pp. 315-20.

বর্তমান বিহার রাজ্যের মুঙ্গের ও ভাগলপুর জেলা দুইটি লইয়া অঙ্গরাজ্য গঠিত ছিল। ৪০০ খৃষ্টাব্দের পরে ইহা মগধ রাজ্যের অন্তর্ভূত হয়। চম্পা হইতে তাম্রলিপ্ত পথটি কজঙ্গলের (রাজমহল) মধ্য দিয়া দক্ষিণমুখী ছিল।

বৌদ্ধ-সাহিত্য হইতে জানা যায় যে সাথবাহ—পরিচালক (সার্থবাহ) বণিকেরা দুই চক্রযুক্ত, দুই বলীবর্দবাহিত শকটে করিয়া এই সব পথে বাণিজ্য দ্রব্য লইয়া যাতায়াত করিত। এক একটি সাথবাহে কখনও কখনও পাঁচশতটি শকট থাকিত। থল নিয়ামকের আদেশে এই শকটগুলি চলিত। রাত্রিকালে তারকাপুঞ্জের অবস্থান দেখিয়া সময় নির্ণীত হইত। পথে নদী থাকিলে পারাপারের জন্য নৌকা ব্যবহৃত হইত। 'সার্থবাহে'-রা দলবদ্ধ ও অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত থাকিত যাহাতে দস্যু-তস্করেরা তাহাদের ক্ষতি না করিতে পারে। দীর্ঘপথ অতিক্রমকালে কতকগুলি নির্দিষ্ট বিশ্রাম-স্থান বা ঘাঁটি ছিল। শ্রাবস্তী হইতে রাজগৃহ গমন-পথে বারটি বিরাম স্থান ছিল, ইহার মধ্যে একটি ছিল বৈশালী। শ্রাবস্তী-পৈঠান পথে অনেকগুলি বিশ্রাম স্থান ছিল, অনেকগুলি নদীও অতিক্রম করিতে হইত। সিন্ধু-সৌবীর অভিমুখে ধাবিত পথ দিয়া পূর্বদেশে ভারবাহী গর্দভ ও উত্তম অশ্ব আমদানী হইত। রাজপুতানার মরুপথে সার্থবাহ থল নিয়ামকের নির্দেশে পথ অতিক্রম করিত।

দেশের অভ্যন্তরে স্থলপথ ব্যতীত জলপথও ব্যবহৃত হইত। জাতকে জলপথে বাভেরুর (বাবিলন) সহিত ভারতের বাণিজ্য সম্পর্কের উল্লেখ আছে (Jatakas No. 339, Vol. III, p.83)।

মগধের রাজগৃহ হইতে তক্ষশিলা পর্যন্ত পথটি ছিল স্থলপথে ভারতের সঙ্গে প্রতীচ্য দেশের ও মধ্য এশিয়ার সংযোগ পথ। এই পথ পুষ্কলাবতী (আধুনিক চারসাড্‌ডা), পুরুষপুর (পেশোয়ার) হইয়া খাইবার গিরিপথের মধ্য দিয়া বাল্‌খ (ব্যাক্‌ট্রিয়া, বাহ্লীক) পৌছিত। এই স্থানটি ছিল পূর্ব দিকে চীন ও মধ্য এশিয়া এবং পশ্চিম দিকে ভূমধ্যসাগর ও কৃষ্ণসাগর তীরবর্তী বন্দর-নগরসমূহ হইতে আগত পথরাজির সংযোগ স্থল। একটি পথ ছিল অক্সাস (Oxus) নদীর ও কাস্পিয়ান সাগরের তীরভূমি ধরিয়া কৃষ্ণসাগরের উপকূলবর্তী বন্দর নগরগুলির দিকে। আর একটি পথ হিরাট্‌ হইয়া কারমানিয়া মরুভূমির উত্তর সীমান্ত ও মেসোপটোমিয়ার (ইরাক) মধ্য দিয়া সিরিয়া দেশের এণ্টিয়োক্‌ (Antioch) শহরে পৌছিত। কান্দাহার হইয়া তৃতীয় একটি পথ হীরাট্‌ পর্যন্ত গিয়া পূর্বোক্ত পথের সহিত সংযুক্ত হইত। কান্দাহার হইতে অপর একটি পথ পার্সিপোলিস, সুসা, সেলুউসিয়া ও ব্যাবিলনের দিকে যাইত (১)।

(১) McCrindle—Ancient India, pp. 96, 99, 100, 110, 204-5 ;
R. C. Majumdar, (Ed.)—History and Culture of the Indian People, Vol. II, (Chap. xxiii), p. 613.

ষষ্ঠ অধ্যায়

পথ পরিচয়—মৌর্যযুগ

বুদ্ধের সময়ে বিম্বিসার ও অজাতশত্রু যথাক্রমে মগধের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। অজাতশত্রু স্বীয় বাহুবলে সংলগ্ন রাজ্যগুলি জয় করিয়া পূর্বভারতে এক বিশাল রাজ্য গঠন করেন। পর্বত বেষ্টিত গিরিব্রজ ছিল মগধের প্রাচীন রাজধানী। বিম্বিসার গিরিব্রজের উত্তরে পর্বতের পাদদেশে রাজগৃহে (বর্তমান পাটনা জেলায় পাটনা হইতে প্রায় ৭০ মাইল দক্ষিণ-পূর্ব দিকে অবস্থিত রাজগীর) তাঁহার রাজধানী স্থাপন করেন। অজাতশত্রু গঙ্গানদীর তীরে পাটলিপুত্র বা পাটলিগ্রামে একটি দুর্গ নির্মাণ করেন। তাঁহার পুত্র অথবা পৌত্রের সময়ে এই স্থানে তাঁহাদের রাজধানী স্থানান্তরিত হয়। এই নগরী প্রতিষ্ঠাকালে ভগবান বুদ্ধ ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন যে এই নগরী ভারতের এক প্রধানা নগরী বলিয়া পরিগণিত হইবে। অজাতশত্রু উত্তর জীবনে বুদ্ধভক্ত হইয়াছিলেন বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে। অজাতশত্রুবংশীয় কয়েকজন রাজা রাজত্ব করার পর নন্দবংশীয় রাজগণ মগধের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন।

শেষ নন্দরাজের সময়ে খ্রীষ্টপূর্ব ৩২৬ অব্দের প্রথম ভাগে আলেকজাণ্ডার ভারত আক্রমণ করেন। সিন্ধুনদী অতিক্রম করিয়া আলেকজাণ্ডার তক্ষশিলায় প্রবেশ করেন। এখানকার অধিপতি অম্ভি বিনা বাধায় আলেকজাণ্ডারের বশ্যতা স্বীকার করেন। বিতস্তা (Jhelum) অতিক্রম করিয়া আলেকজাণ্ডারকে পুরুরাজের প্রবল প্রতিরোধের সম্মুখীন হইতে হয়। সুসজ্জিত ও সুশিক্ষিত গ্রীক্ বাহিনীর হস্তে পুরুর সৈন্যদল বিধ্বস্ত হয়। গুরুতরভাবে আহত হইয়া পুরুরাজ বন্দী রূপে আলেকজাণ্ডারের নিকট নীত হন। আলেকজাণ্ডারের সম্মুখে পুরুরাজের আচরণ ও বীরত্বব্যঞ্জক উত্তর-প্রত্যুত্তরের কাহিনী আমাদের বালকদের নিকটও সুপরিচিত।

পুরুকে পরাজিত করিয়া আলেকজাণ্ডার আরও পূর্বদিকে ইরাবতী (Ravi) অভিমুখে অগ্রসর হইতে থাকেন। এই অঞ্চলেও তাঁহাকে প্রবল প্রতিরোধের সম্মুখীন হইতে হয়। এই অঞ্চলের রাজাদের তিনি অচিরেই পরাস্ত করিতে পারিয়াছিলেন। বিজয়াভিলাষী আলেকজাণ্ডার আরও পূর্বমুখে বিপাশা নদীর তীরভূমি পর্যন্ত অগ্রসর হইতে থাকেন, কিন্তু ম্যাসিডন-বাহিনী

আর পূর্বদিকে অগ্রসর হইতে সম্মত না হওয়ায় আলেকজাণ্ডার বালুচিস্তানের মরুভূমির পথেই প্রত্যাবর্তন করিতে বাধ্য হন। পরাজিত ভারতীয় সৈন্যবাহিনীর শৌর্য-বীর্য গ্রীক্ বাহিনীর মনোবল ধ্বংস করিয়াছিল। পূর্বাঞ্চলের সেনাবাহিনীর বীরত্বের খ্যাতিও তাহাদিগকে ভীত করিয়া তুলিয়াছিল। পাঞ্জাব ও সিন্ধুর বিস্তৃত অঞ্চল জয় করা আলেকজাণ্ডারের পক্ষে সহজসাধ্য হয় নাই, প্রায় সর্বত্রই তাঁহাকে প্রবল প্রতিরোধের সম্মুখীন হইতে হয়। গ্রীক্ ঐতিহাসিকদের রচনা হইতে জানা যায় অনেক সময়ে নারীগণও বিদেশী শত্রুকে প্রতিরোধ করিতে অগ্রসর হইত। ভীত ও দুর্বল জনপদপতি আলেকজাণ্ডারের নিকট বিনা যুদ্ধে আত্ম-সমর্পণে উদ্যত—এমন রাষ্ট্রে ব্রাহ্মণেরা ভীত রাজাকে অগ্রাহ্য করিয়া প্রজাশক্তিকে শত্রুর আক্রমণ প্রতিহত করিতে উদ্বুদ্ধ করিতেন। অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাষ্ট্রে বিভক্ত না হইলে আলেকজাণ্ডারের পক্ষে পাঞ্জাব বিজয় কখনও সম্ভব হইত না। ভারতের অভ্যন্তরে বিজিত রাষ্ট্রসমূহকে তিনভাগে বিভক্ত করিয়া আলেকজাণ্ডার এক এক জন স্থানীয় রাজাকে করদ রাজা রূপে প্রতিষ্ঠিত করিয়া যান। ভারতের সীমান্তে সিন্ধু নদীর পশ্চিম তীরবর্তী ভূ-ভাগ শাসনের নিমিত্ত তিনি গ্রীক্ শাসনকর্তা বা Governor নিয়োগ করিয়াছিলেন।

বহিঃশত্রুর আক্রমণের ভয়াবহতা ও একতাহীনতার পরিণাম সম্বন্ধে ভারতবাসীর মন এই সময়ে সচেতন হইয়া উঠে। এই পারিপার্শ্বিকের সুযোগে মগধ হইতে নির্বাসিত এক অজ্ঞাত যুবক চন্দ্রগুপ্ত, স্বীয় বাহুবলে ও কৌশলে মগধ অধিকার করেন ও ভারতের মৃত্তিকা হইতে গ্রীক্ শাসনের মূলোচ্ছেদ করেন।

অচিরকালেই নিম্নগাঙ্গেয় উপত্যকা হইতে হিন্দুকুশ পর্বতমালা পর্যন্ত বিশাল ভূভাগ—এক কথায় সমগ্র আর্যাবর্ত চন্দ্রগুপ্তের করতলগত হয়। ঐতিহাসিক কালে চন্দ্রগুপ্তই ভারতবর্ষের প্রথম রাজচক্রবর্তী সম্রাট্।

আনুমানিক ৩২৪ খ্রীঃ পূর্বাব্দে চন্দ্রগুপ্ত মগধের সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি প্রায় পঁচিশ বৎসর কাল রাজত্ব করিয়াছিলেন।

গ্রীক্ রাজদূত হিসাবে মেগাস্থিনিস্ সম্ভবতঃ খ্রীঃ পূঃ ৩২৪ হইতে ২৯৯ অব্দ পর্যন্ত কোন সময়ের মধ্যে কিছুকাল পাটলিপুত্র নগরে বাস করেন। তিনি তাঁহার ভারতবাসের যে বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন তাহাতে দেখা যায় যে চন্দ্রগুপ্তের সৈন্যবাহিনী বিপুল ছিল; সমর বিভাগ ছয়ভাগে বিভক্ত ছিল। কৃষি, পথনির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণ, খনি, বন ও মৃগয়াকার্য পরিচালনের

জন্য পৃথক পৃথক বিভাগ ছিল। পৌরশাসন ব্যবস্থা শৃঙ্খলার সহিত পরিচালিত হইত। মেগাস্থিনিস ভারতবাসীর সদাচার, সারল্য ও সততার বহু প্রশংসা করিয়াছেন।

মেগাস্থিনিস কোন্ পথে পাটলিপুত্রে আগমন করেন তাহার বিশদ বিবরণ পাওয়া যায়। ভারত-সীমান্ত হইতে প্রায় ১১৫৬ মাইল দীর্ঘ একটি সুরক্ষিত, সুপ্রচলিত পথ দিয়া মেগাস্থিনিস পাটলিপুত্রে আগমন করেন। এই পথ আটভাগে বিভক্ত ছিল। সীমান্তবর্তী পুষ্কলাবতী (প্রাচীন গান্ধার রাজ্যের রাজধানী, পেশোয়ার হইতে ১৮ মাইল উত্তরে এই নগরী অবস্থিত ছিল) হইতে উদ্‌ভাণ্ড (বর্তমান ওহিন্দ্) হইয়া মেগাস্থিনিস তক্ষশিলায় আসেন। তক্ষশিলা হইতে সিন্ধু ও বিতস্তা নদীর তীরভূমি ধরিয়া বিপাশা-শতদ্রু অভিমুখে অগ্রসর হইয়া তিনি যমুনা উপত্যকায় আসেন। হস্তিনাপুর (মীরাটের ২২ মাইল উত্তর পূর্ব কোণে অবস্থিত) হইয়া তিনি গাঙ্গেয় উপত্যকায় উপনীত হন। অবশেষে তিনি কনৌজ ও প্রয়াগ (এলাহাবাদ) হইয়া পাটলিপুত্র পৌছান। মেগাস্থিনিস লিখিয়াছেন যে এই পথটি গঙ্গানদীর মোহানা পর্যন্ত (তাম্রলিপ্ত ?) বিস্তৃত ছিল (১)। সম্ভবতঃ পাটলিপুত্র-তাম্রলিপ্ত পথটি মেগাস্থিনিস নিজে পরিক্রমণ করেন নাই। মেগাস্থিনিসের বর্ণিত তক্ষশিলা—পাটলিপুত্র পর্যন্ত প্রায় বারশত মাইল পথটির কিছু দুর অন্তর পথের দূরত্বসূচক ফলক ছিল। পথের দুইধার বৃক্ষশোভিত ছিল ও কিছু দূরে দূরে পানীয় জলের কূপ ও বিশ্রাম-স্থানের ব্যবস্থা ছিল (২)।

ভারত-সীমান্তে অবস্থিত গ্রীক্ রাষ্ট্র ব্যাক্ট্রিয়ার সহিত এই পথটি ছিল বাণিজ্যিক যোগসূত্র। এই যুগে পাটলিপুত্র হইতে উত্তরমুখী একটি পথ শ্রাবস্তী-বৈশালীর মধ্য দিয়া নেপাল পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। দক্ষিণ-পশ্চিমমুখী একটি পথ কৌশাম্বী-উজ্জয়িনীর মধ্য দিয়া সৌরাষ্ট্রের Barygaza (ভারুকচ্ছ) বা আধুনিক বরোচ্ বন্দর পর্যন্ত প্রসারিত ছিল (৩)।

---

(১) H G. Rawlinson—Intercourse between India and the Western World—pp. 46, 64.

(২) E. B. Havell—The History of Aryan Rule in India, pp. 71-72 ; McCrindle—Ancient India as described by Megasthenes and Arrian—pp. 45-50.

(৩) Prezylusky—La Legende de l'empereur Asoka—p. 9

কৌটিল্য বা চাণক্য সম্ভবতঃ মৌর্য চন্দ্রগুপ্তের মন্ত্রী ছিলেন। ফ্লিট্, ভিন্সেণ্ট্ স্মিথ, হপকিন্স প্রভৃতি পণ্ডিতদের মতে মৌর্যযুগে অর্থাৎ ৩২৩ হইতে ২৯৮ খ্রীঃ পূর্বাব্দের মধ্যেই কৌটিল্য অর্থশাস্ত্র রচনা করেন (১)। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে চারিটি বাণিজ্যপথের উল্লেখ আছে। দুইটি পথ যথাক্রমে পূর্ব ও পশ্চিম অভিমুখী ও দুইটি পথ যথাক্রমে উত্তর ও দক্ষিণমুখে প্রসারিত ছিল। উত্তরগামী পথ হইতে হস্তী, অশ্ব, গন্ধদ্রব্য, গজদন্ত, পশম, পশুচর্ম ও বিন্ধ্যাভিমুখী দক্ষিণগামী মহাকাল পথ হইতে শঙ্খ, হীরক, মণি-মাণিক্য, মুক্তা ও স্বর্ণ বাহিত হওয়ার উল্লেখ আছে (২)। কৌটিল্যের উল্লিখিত পথাবলী যে মৌর্যযুগের পথ সংস্থানের প্রতিরূপ গ্রীক্ ঐতিহাসিকদের রচনা হইতে ইহা সমর্থিত হয়। গ্রীক্ ঐতিহাসিকদের বিবরণে তক্ষশিলা—পাটলিপুত্র পথ ব্যতীত পুষ্কলাবতী হইতে দিল্লী এবং তথা হইতে উজ্জয়িনী পর্যন্ত একটি পথের উল্লেখ আছে। মৌর্যযুগে ভারতবর্ষে বহু সংখ্যক নগর বর্তমান ছিল, গ্রামবাসীর তুলনায় নগরবাসীর সংখ্যা নগণ্য ছিল না। গ্রীক্ ঐতিহাসিকদের বিবরণ হইতে জানা যায় যে শুধু মাত্র পাঞ্জাবে আলেকজাণ্ডার দুই হাজার নগর জয় করেন। টলেমির ভারতবৃত্তান্তে (আনুমানিক খ্রীঃ পূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দী) ভারতে অবস্থিত বহু নগরের কথা উল্লিখিত হইয়াছে (৩)।

অর্থশাস্ত্রের নীতি অনুযায়ী নির্মিত এই অসংখ্য নগর হইতে নির্গত অসংখ্য পথ দেশের সর্বত্র প্রসারিত থাকিয়া সমগ্র ভারতবর্ষের জন-সাধারণের সুখ সম্পদ বৃদ্ধির সহায়তা করিত। প্রধান প্রধান পথগুলির স্থানে স্থানে পথের দূরত্বজ্ঞাপক প্রস্তরফলক ও বিশ্রামশালা থাকিত। মৌর্য সম্রাট অশোক নিজেও পথের ধারে কূপ খনন ও বৃক্ষরোপণ করাইয়াছিলেন (৪)।

কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে ও অন্যান্য প্রাচীন পুস্তকে পথ সম্বন্ধীয় নানা জ্ঞাতব্য তথ্য সন্নিবেশিত দেখিতে পাওয়া যায়। এই পুস্তকগুলি বিভিন্ন সময়ে লিখিত। এই পুস্তকের পরিশিষ্টে এইগুলির আলোচনা করা হইবে।

সম্রাট চন্দ্রগুপ্তের মৃত্যুর পর তৎপুত্র বিন্দুসার মগধের সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি প্রায় ত্রিশ বৎসর কাল রাজত্ব করেন।

---

(১) Kautilya's Arthasastra—B. Shama Sastri (Bangalore, 1915).

(২) রাধাগোবিন্দ বসাক—কৌটিলীয় অর্থশাস্ত্র (২ খণ্ড, ১ম অধি, ১২ অঃ)।

(৩) J. W, McCrindle, Ancient India as described by Ptolemy—

(৪) "পংথেহ কূপা চ খানাপিতা ব্রছা চ রোপাপিতা পরিভোগায় পসুমনুসানং" অশোকের দ্বিতীয় গিরিলিপি (গির্ণার) (D.C. Sarkar Vol. I, p. 18—Select Inscriptions).

বিন্দুসারের মৃত্যুর পর তৎপুত্র অশোক আনুমানিক ২৭৩ খ্রীঃ পূর্বাব্দে সিংহাসনে অধিরোহণ করেন। সিংহাসনে আসীন হইয়া তিনি কলিঙ্গ রাজ্য জয় করিতে অগ্রসর হন। বঙ্গ দেশের দক্ষিণ সীমান্ত হইতে ভারতের পূর্ব উপকূলস্থ গোদবরীর তীর পর্যন্ত কলিঙ্গ রাজ্যের বিস্তৃতি ছিল। বর্তমানে কলিঙ্গ বলিতে মোটামুটি ভাবে বর্তমান ওড়িশা রাজ্যই ধরা হয়। মৌর্যযুগে বর্তমান ওড়িশা অঞ্চল ব্যতীত বর্তমান অন্ধ্র প্রদেশেরও কিছু অংশ প্রাচীন কলিঙ্গ রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। তদানীন্তন কলিঙ্গের রাজধানী ছিল তোসলী (বর্তমান ওড়িশা রাজ্যের ভুবনেশ্বর শহর হইতে ৬ মাইল দূরে অবস্থিত এই স্থানটির বর্তমান নাম ধৌলি—Dhauli)। অশোকের কলিঙ্গ যুদ্ধে শত্রু পক্ষের আড়াই লক্ষ সৈন্য আহত হইয়াছিল। মৃতের সংখ্যা গণনায় পাওয়া যায় না। অনুমান করা যাইতে পারে যে অশোক অন্যূন পাঁচ লক্ষ সৈন্য লইয়া মগধ হইতে কলিঙ্গ অভিযান করেন। এত বিপুল সংখ্যক সৈন্য ও সমর সম্ভার লইয়া যাওয়ার জন্য নিঃসন্দেহে পাটলিপুত্র হইতে তোসলী পর্যন্ত একটি উত্তম পথ ছিল, অথবা ইহা নির্মিত হইয়াছিল। এই পথটি সম্ভবতঃ মহানদী তীরবর্তী কটক হইতে যাজপুর হইয়া বৈতরণী নদীর উপত্যকায় কেওনঝর হইয়া ময়ূরভঞ্জ জেলার খিচিং পৌঁছিত। খিচিং হইতে উত্তর-পূর্ব মুখে বর্তমান রাইরঙ্গপুর শহর ও বাহালদা হইয়া পথটি বর্তমান সুবর্ণরেখার উপত্যকায় পৌঁছিয়া কোনস্থানে তাম্রলিপ্ত-পাটলিপুত্র পথের সহিত মিলিত হইত। অশোকের পরবর্তী কালে খ্রীষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে কলিঙ্গরাজ খারবেল মগধ ও অঙ্গদেশ (অর্থাৎ দক্ষিণ ও পূর্ব বিহার) আক্রমণ করেন। খারবেল সম্ভবতঃ অশোক ব্যবহৃত পথ ধরিয়াই মগধ ও অঙ্গ রাজ্যাভিযান করেন। কলিঙ্গ বিজয়ের পর অশোকের সাম্রাজ্য গৌরবের চরম সীমায় উপনীত হয়। অশোকের অনুশাসনগুলি হইতে জানা যায় যে উত্তর ভারত ব্যতীত ব্যাকট্রিয়া (বাহ্লীক), কাবুল, গুজরাত এবং দাক্ষিণাত্যের অনেক অংশ অশোকের অধীনতা স্বীকার করিয়া লইয়াছিল। কলিঙ্গ যুদ্ধের লোকক্ষয়ে অনুতপ্ত অশোক বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেন এবং অহিংসা নীতি অবলম্বন করেন।

কলিঙ্গ বিজয়ের পর অশোকের সাম্রাজ্য (১) উত্তরাপথ (২) অবন্তী (৩) দক্ষিণাপথ (৪) কলিঙ্গ ও (৫) মগধ এই পাঁচটি প্রদেশ রূপে বিভক্ত ছিল। যথাক্রমে তক্ষশিলা, উজ্জয়িনী, সুবর্ণগিরি, তোসলী ও

পাটলিপুত্র এই প্রদেশগুলির রাজধানী ছিল। মগধ-প্রদেশ সম্রাটের প্রত্যক্ষ শাসনাধীন ছিল। প্রাদেশিক শাসনকর্তৃগণ (Governors) অবশিষ্ট প্রদেশ-গুলি সম্রাটের নির্দেশানুযায়ী শাসন করিতেন। ঐতিহাসিক কালে ইতিপূর্বে কোন ভারতীয় নরপতি এত বড় বিশাল রাষ্ট্র শাসন করেন নাই। সম্রাট্ অশোক বৌদ্ধধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে পশ্চিম এশিয়া, আফ্রিকা, পূর্ব ইউরোপ ও সিংহল প্রভৃতি স্থানে ধর্ম প্রচারক প্রেরণ করেন।

জ্ঞানী, উদার-হৃদয়, সুশাসক ও প্রজারঞ্জক সম্রাট্ হিসাবে জগতের ইতিহাসে অশোক অতুলনীয় হইয়া আছেন। পৃথিবীর ইতিহাস লেখক মনীষী ওয়েলস্ তাঁহাকে পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ নরপতি রূপে অভিহিত করিয়াছেন (১)।

খ্রীঃ পূঃ ২৩২ অব্দে সম্রাট্ অশোক পরলোক গমন করেন। তাঁহার মৃত্যুর পরেও মৌর্যবংশীয় নরপতিগণ খ্রীঃ পূঃ ১৮৪ অব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেন। মৌর্যবংশের পতনের পর শুঙ্গ বংশীয় রাজগণ মগধের সিংহাসন অধিকার করিয়াছিলেন।

মৌর্য সম্রাট্দের পতনের পর মগধের সার্বভৌমত্ব ক্ষুন্ন হয়। ভারত আবার খণ্ড খণ্ড রাজ্যে বিভক্ত হইয়া যায়।

সম্রাট্ অশোকের পরে ও গুপ্ত রাজবংশের অভ্যুদয়ের পূর্বে ভারতের একজন মহাপরাক্রান্ত নৃপতি হিসাবে কুষাণ সম্রাট্ কণিষ্কের নাম উল্লেখ-যোগ্য। সম্রাট্ কণিষ্ক ৭৮ খ্রীস্টাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করেন বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে। এই সময় হইতেই শকাব্দ গণনা করা হয়। পেশোয়ার (পুরুষপুর) কণিষ্কের রাজধানী ছিল। মধ্য এশিয়া হইতে বারাণসী পর্যন্ত কণিষ্কের সাম্রাজ্য বিস্তৃত ছিল। কণিষ্ক বৌদ্ধধর্মের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। কুষাণরাজ বাসুদেবের মৃত্যুর পর কুষাণ সাম্রাজ্য খণ্ড খণ্ড হইয়া যায়।

মৌর্য যুগের পথাবলী সাধারণ ভাবে নিম্নলিখিত রূপ ছিল ইহা দেখা যাইতেছে: পাটলিপুত্র হইতে ভারতের পশ্চিম সীমান্তে তক্ষশিলা-পুষ্কলাবতী পর্যন্ত রাজমার্গ বা উত্তরাপথ। গঙ্গা উপত্যকায় পাটলিপুত্র বারাণসী হইয়া কৌশাম্বীপথ। কৌশাম্বী হইতে যমুনা উপত্যকা ধরিয়া মথুরা এবং তথা হইতে ইন্দ্রপ্রস্থ (দিল্লী) কুরুক্ষেত্র পথ। কুরুক্ষেত্রের পর এই পথটি কোন একস্থলে উত্তরাপথ

(১) H. G. Wells,—A Short History of the World (Pelican, p. 105).

বা রাজমার্গের সহিত মিলিত হইয়া তক্ষশিলা পৌঁছিত। তক্ষশিলা হইতে হিন্দুকুশ পর্বতমালার মধ্য দিয়া এই পথটি মধ্য এশিয়া ও চীনগামী পথের সহিত মিলিত হইত। এই উত্তরাপথের একটি প্রান্ত বিদিশা (বেসনগর, ভিলসার নিকট) ও উজ্জয়িনীর মধ্য দিয়া নর্মদার মোহানায় অবস্থিত ভারুকচ্ছ (বরোচ) বন্দরে পৌঁছিত। একটি শাখাপথ মথুরা হইতে রাজস্থানের মরুভূমি অতিক্রম করিয়া সিন্ধু নদীর মোহানায় সিন্ধু সৌবীর রাজ্যের বন্দর নগর পোটালায় পৌঁছিত। রাজগৃহ হইতে একটি শাখাপথ মূলপথ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া শ্রাবস্তী, অহিছত্র (বেরিলীর নিকট) হস্তিনাপুর হইয়া কুরুক্ষেত্রের নিকট মূল উত্তরাপথের সহিত যুক্ত হইত। মৌর্যযুগে অবন্তী রাজ্যের উজ্জয়িনী অন্যতম শাসনকেন্দ্র ছিল। পরবর্তী যুগে গুপ্ত-শাসনকালে উজ্জয়িনীর মর্যাদা আরও বৃদ্ধি পায়। এই সময়ে উজ্জয়িনী হইতে উত্তর পূর্বমুখে বিদিশা পর্যন্ত একটি পথ ছিল, একটি পথ ছিল ভারুকচ্ছ বা বরোচ, পর্যন্ত, তৃতীয় পথটি ছিল গোদাবরী তীরস্থ পৈঠান বা প্রতিষ্ঠান। প্রতিষ্ঠানগামী এই পথটি গুপ্ত শাসনকালে দক্ষিণগামী প্রধান পথ ছিল। পৈঠানের সহিত দক্ষিণ ভারতে কাঞ্চী মাদুরা প্রভৃতি স্থানের স্থলপথে যোগাযোগ ছিল (১)।

---

(১) A.L. Basham,—The Wonder that was India, pp. 223-25 ;
B C. Law—Ujjaini in ancient India. p. 2.

সপ্তম অধ্যায়

পথ পরিচয়—গুপ্তযুগ

মৌর্য নরপতিগণ ভারতে এক রাষ্ট্রীয়তার যে আদর্শ স্থাপন করেন তাহা খৃষ্ট জন্মের পূর্বেই মলিন হইয়া যায়। কয়েক শতাব্দীর অন্ধকারাচ্ছন্ন ইতিহাস ভেদ করিয়া চতুর্থ খৃষ্টাব্দের প্রথম পাদে গুপ্ত সম্রাট্ চন্দ্রগুপ্ত (প্রথম) আর্যাবর্তের রাজচক্রবর্তীত্ব লাভের সাধনায় আত্মনিবেশ করেন। গুপ্ত রাজবংশের এই তৃতীয় পুরুষ অচির কালের মধ্যেই মগধকে তাহার পূর্ব গৌরবে প্রতিষ্ঠিত করেন—এই সময়ে উত্তর ভারতে তাঁহাকে প্রতিরোধ করার মত সামরিক প্রতিভা আর কাহারও ছিল না। পশ্চিমে প্রয়াগ পর্যন্ত তাঁহার রাজ্য বিস্তৃত ছিল। প্রাচীন পাটলিপুত্র নগরে তাঁহার রাজধানী ছিল। চন্দ্রগুপ্তের পুত্র সমুদ্রগুপ্ত পিতার প্রতিষ্ঠিত রাজ্যকে তাঁহার বিরাট সামরিক-প্রতিভা বলে পূর্বে কামরূপ হইতে পশ্চিমে পাঞ্জাব পর্যন্ত বিস্তৃত করেন। সমুদ্রগুপ্ত নিজে তাঁহার বিস্তৃত রাজ্য শাসন করিতেন। উত্তরে হিমালয়ের পাদদেশ হইতে দক্ষিণে নর্মদাতীরস্থ ভূভাগ এবং পূর্বে ব্রহ্মপুত্র ও পশ্চিমে যমুনা ও চম্বল নদীমধ্যস্থ ভূভাগ তাঁহার প্রত্যক্ষ শাসনাধীন ছিল। পরবর্তীকালে ভারতীয় রাজারা সমুদ্রগুপ্তের আদর্শে রাজ্যশাসন শ্লাঘ্য বলিয়া মনে করিতেন। সমুদ্রগুপ্ত অশ্বমেধ যজ্ঞ সম্পন্ন করেন এবং ইহা দ্বারা ভারতবর্ষে তাঁহার "রাজচক্রবর্তীত্ব" প্রতিষ্ঠিত হয়।

জনৈক হরিসেন লিখিত স্তম্ভগাত্রে খোদিত সমুদ্রগুপ্তের একটি প্রশস্তি লিপি বর্তমানে এলাহাবাদে পাওয়া গিয়াছে। ঐতিহাসিকদের মতে হরিসেন সমুদ্রগুপ্তের সভাসদ্ ছিলেন এবং সমুদ্রগুপ্তের জীবদ্দশায় ঐ প্রশস্তি রচিত হয়। এই প্রশস্তি দৃষ্টে জানা যায় যে সমুদ্রগুপ্ত দাক্ষিণাত্যের বারটি ও উত্তরাপথের নয়টি রাজ্য জয় করেন। ভারতের পূর্বাঞ্চলের পাঁচটি নরপতি তাঁহার বশ্যতা স্বীকার করেন। ইঁহারা ছিলেন সমতট (মধ্য বাঙ্গলা), কামরূপ, নেপাল ও ডবাকের অধিপতি। ডবাক রাজ্য সম্ভবতঃ বর্তমান আসামের নগাঁও-অঞ্চলে অবস্থিত ছিল। পশ্চিম সীমান্তের কর্তৃপুর (কাংড়া, গাড়োয়াল, আলমোরা, কুমায়ুঁ অঞ্চল), শক ও কুষাণ বংশীয় খণ্ডরাজ্যের অধিপতিগণ এবং সুদূর দক্ষিণের সমুদ্র-পারবর্তী সিংহলরাজও তাঁহার পদানত হন। ইহার মধ্যে কোন কোন রাজাকে সমুদ্রগুপ্ত করদ-রাজরূপে গ্রহণ করিয়া অবশিষ্ট অঞ্চলের শাসনকার্য

স্বহস্তে পরিচালন করিতেন। এলাহাবাদ প্রশস্তিতে সমুদ্রগুপ্তকে শতযুদ্ধের নায়ক বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। এই সমরাভিযানে দেশের প্রচলিত পথগুলিই ব্যবহৃত হইয়াছিল, সমুদ্রগুপ্ত হয়ত কিছু নূতন পথ নির্মাণ করিয়াছিলেন।

সমুদ্রগুপ্তের পুত্র দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত—বিক্রমাদিত্য নামে খ্যাত। অবশ্য এই জনপ্রিয় আখ্যা লইয়া অনেক নৃপতি পূর্বে ও পরেও রাজত্ব করিয়াছিলেন। আনুমানিক ৩৮০ খৃষ্টাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করিয়া দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত মালব, গুজরাত, কাথিয়াওয়াড় ও পাঞ্জাবের কতক অংশ জয় করেন। শক-ক্ষত্রপগণকে পরাভূত করিয়া মালব ও সৌরাষ্ট্র জয় করার পর তিনি শকারি নামে বিখ্যাত হন। স্বীয় জামাতা বাকাটকরাজ দ্বিতীয় প্রবর সেনের মৃত্যুর পর তিনি দক্ষিণাপথের গোদাবরী তীরবর্তী এই অঞ্চলের শাসনভারও গ্রহণ করেন। বুন্দেলখণ্ড হইতে হায়দ্রাবাদ পর্যন্ত বাকাটক রাজ্যের বিস্তৃতি ছিল। ৩৮০ খৃষ্টাব্দ হইতে ৪১৩ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের রাজত্বকাল।

দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের পর তৎপুত্র কুমারগুপ্ত ও পৌত্র স্কন্দগুপ্ত পূর্বপুরুষদের ন্যায় প্রবল পরাক্রমে রাজত্ব করেন ও নূতন নূতন রাজ্য জয় করিয়া রাষ্ট্রের সীমানা প্রসারিত করেন। স্কন্দগুপ্ত আক্রমণকারী হূনদের ভারতবর্ষ হইতে বিতাড়িত করেন। যতদিন তিনি জীবিত ছিলেন ততদিন পর্যন্ত হূনেরা গুপ্ত সাম্রাজ্যে প্রবেশ করিতে আর সাহসী হয় নাই। আনুমানিক ৪৮৮ খৃষ্টাব্দে স্কন্দগুপ্তের মৃত্যু হয়। গুপ্তযুগে ভারতবাসীর একজাতীয়ত্বের চেতনা প্রবলভাবে উদ্বুদ্ধ হয় ও জাতীয় জীবনের নানা বিভাগে—সাহিত্য, ধর্ম ও শিল্পে এই জাগরণের প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। কালিদাসের কাব্য, বরাহ-মিহিরের জ্যোতিষিক আবিষ্কার, অজন্তার চিত্রকলা, শৈব ও বৈষ্ণব ধর্মের অভ্যুত্থান, সুসম্পন্ন মহাভারত, বায়ুপুরাণ ও মৎস্যপুরাণ গুপ্তযুগের দান। স্বদেশপ্রেমিক ঐতিহাসিকদের মতে গুপ্তযুগ ভারতবর্ষের স্বর্ণ-উষা কাল; ভারতবাসী এই যুগেই সর্বাপেক্ষা সুখী জীবন যাপন করিত। ভারতীয় সংস্কৃতি এই স্বর্ণ-উষা কালেই সর্বাপেক্ষা অধিক স্ফূর্তি লাভ করিয়াছিল (১)।

---

(১) "The Gupta Emperors became the symbols of a tremendous national upsurge. Life was never happier, our culture never more creative than during the golden prime of India"—The Classical Age, History and Culture of the Indian People—Vol. IV, p. XV.

গুপ্ত যুগে বণিক-সঙ্ঘ ও বণিকদের মিলিত চেষ্টায় ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রভূত উন্নতি সাধিত হয়। এই সমৃদ্ধি সমাজ জীবনেও প্রতিফলিত হয়। দেশের অভ্যন্তরে বস্ত্র, খাদ্য-শস্য, লবণ, মশলা, মণি-মাণিক্য প্রভৃতির ব্যবসায় চলিত। ব্যবসায়-দ্রব্য জলপথ ও স্থলপথে বাণিজ্য পথগুলি দ্বারা পরিবাহিত হইত। বরোচ., উজ্জয়িনী, পৈঠান, বিদিশা, প্রয়াগ, বারাণসী, গয়া, পাটলিপুত্র, বৈশালী, তাম্রলিপ্ত, কৌশাম্বী, মথুরা, অহিচ্ছত্র (বেরিলীর বামনগর গ্রামের নিকট), পুষ্কলাবতী (পেশোয়ারের ১৭ মাইল দক্ষিণ পশ্চিমে অবস্থিত বর্তমান চারসাড্ডা) প্রভৃতি নগরগুলি সুসংস্কৃত ও সুরক্ষিত পথ দ্বারা পরস্পরের সহিত সংযুক্ত ছিল। এই নগরগুলি ছিল গুপ্ত-যুগের প্রধান বাণিজ্য কেন্দ্র। শ্রেণীবদ্ধ গোশকট, অথবা অশ্ব, হস্তী প্রভৃতি পশুপৃষ্ঠে দ্রব্যাদি বহন করা হইত। ব্রহ্মপুত্র, গঙ্গা, নর্মদা গোদাবরী, কৃষ্ণা প্রভৃতি নদীপথেও প্রচুর দ্রব্যসম্ভার বাহিত হইত। এই সময়ে ভারতে পোত নির্মাণ-বিদ্যার প্রভূত উন্নতি হইয়াছিল। ৪০০ যাত্রীর স্থান সঙ্কুলান হয় এমন সুবৃহৎ পোতও এই যুগে প্রস্তুত হইত। বাঙ্গলার তাম্রলিপ্ত (বর্তমান মেদিনীপুর জেলার তমলুক) হইতে সিংহল, চীন, জাভা ও সুমাত্রা দ্বীপে পণ্যপূর্ণ পোতগুলি যাতায়াত করিত। অন্ধ্র দেশেও অনেকগুলি বন্দর অবস্থিত ছিল, এই গুলিও বহির্ভারতের সহিত যোগাযোগ রক্ষা করিত (১)।

শকরাজ রুদ্র সিংহ দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত কর্তৃক পরাভূত হওয়ার ফলে গুজরাত এবং সৌরাষ্ট্রের সমৃদ্ধ বন্দরগুলি গুপ্ত-সাম্রাজ্যের অধিকার ভুক্ত হয়। এইভাবে সমগ্র ভারতের সহিত জলপথেও পশ্চিম জগতের সহিত সংযোগ দৃঢ়ীভূত হয়। এক রাষ্ট্রের অধীন থাকায় যাতায়াতের সুগমতা, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রত্যেক রাষ্ট্রে শুল্ক প্রদান ও অন্যান্য বাধার অপসারণ গুপ্ত যুগে বাণিজ্যিক শ্রীবৃদ্ধির অন্যতম কারণ (২)। এই সময়ে উত্তর ও দক্ষিণ ভারতের মধ্যে বাণিজ্যেরও উন্নতি হয়। বাণিজ্য-পথগুলির একটি ছিল জব্বলপুরের মধ্য দিয়া পূর্ব উপকূল অভিমুখে। উজ্জয়িনী, নাসিক ও কারওয়ার হইয়া পশ্চিম উপকূলের বাণিজ্য-পথটি প্রসারিত ছিল। এই পথ সৈন্য-বাহিনী এবং তীর্থ-যাত্রিগণ কর্তৃকও ব্যবহৃত হইত। গুপ্ত-সম্রাটেরা এই মহাপথগুলির রক্ষণাবেক্ষণে মনোযোগী ছিলেন।

(১) দ্রষ্টব্য—R. C. Majumdar and Altekar (Ed.)—The Vakataka—Gupta Age—pp. ৪২৯-৩০.

(২) K. M. Panikkar,—A Survey of Indian History, p. ৫২.

স্কন্দগুপ্তের পর পুরুগুপ্ত, বুধগুপ্ত, নরসিংহ গুপ্ত প্রভৃতি কয়েকজন রাজা ষষ্ঠ শতাব্দীর শেষভাগ পর্যন্ত সাম্রাজ্যকে কোনরূপে বাঁচাইয়া রাখেন। তাহার পর গুপ্ত সাম্রাজ্যের মহিমা অস্তমিত হয়।

সম্রাট দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্যের রাজত্বকালে চৈনিক-পরিব্রাজক ফা-হিয়ান (Fa-Hsien, Fah-hian) বৌদ্ধধর্ম সম্বন্ধে জ্ঞানলাভের জন্য ভারতবর্ষে আগমন করেন। ফা-হিয়ানের ভ্রমণবৃত্তান্ত হইতে তদানীন্তন ভারতবর্ষ সম্বন্ধে বহু মূল্যবান তথ্য পাওয়া যায়।

৩৯৯ খৃষ্টাব্দে ফা-হিয়ান তাঁহার কয়েকজন সঙ্গীসহ চীনের চাঙ্-আন (Chang An) নামক স্থান হইতে যাত্রা করিয়া পশ্চিম চীন, গোবি মরু, খোটান পর্বতমালা ও পামীর অতিক্রম করিয়া সিন্ধু নদীর তীরে উপস্থিত হন। নদী পার হইয়া তাঁহারা উডিয়ান (আধুনিক চিত্রল ও তাহার পূর্বদক্ষিণ অংশ) পৌছান। চীন হইতে ভারতের অভ্যন্তর ভাগে পৌছিতে তাঁহাদের দীর্ঘ ছয় বৎসর সময় লাগিয়াছিল। উডিয়ান হইতে তাঁহারা গান্ধার রাজ্যে প্রবেশ করেন। অতঃপর পূর্বমুখে অগ্রসর হইয়া তাঁহারা তক্ষশিলা পৌছান। তক্ষশিলা হইতে তাঁহারা তদানীন্তন কালের পুরুষপুর (পেশোয়ার) আগমন করেন। পুরুষপুর হইতে নগ্রহার (জালালাবাদের নিকট) নামক স্থানে আসিয়া তাঁহারা আফগানিস্তান অভিমুখে যাত্রা করেন। এই সময় আফগানিস্তানে তিন সহস্র বৌদ্ধ-শ্রমণ বাস করিতেন। আফগানিস্তান হইতে আবার তাঁহারা পূর্বমুখে যাত্রা করিয়া ভিদা নামক স্থানে পৌছান। অতঃপর পূর্বদক্ষিণ মুখে আশী যোজন পথ অতিক্রম করিয়া তাঁহারা মথুরা পৌছান। বুদ্ধদেবের আবির্ভাবের বহুপূর্ব হইতে প্রচলিত গান্ধার-তক্ষশিলা-মথুরা পথটিই যে চৈনিক পরিব্রাজকেরা ব্যবহার করিয়াছিলেন এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। মথুরা হইতে তাঁহারা সঙ্কিসা নামক স্থানে আগমন করেন। সঙ্কিসা বর্তমান উত্তরপ্রদেশের ফারুখাবাদ জেলার একটি গ্রাম। উত্তর রেলপথের (Northern Rly.) শিখোহাবাদ-ফারুখাবাদ শাখার মোটা রেলওয়ে স্টেশন হইতে এইস্থান চার মাইল উত্তরপূর্ব কোণে অবস্থিত। সঙ্কিসা হইতে সাতযোজন পথ অতিক্রম করিয়া পরিব্রাজকেরা কান্যকুব্জ বা কনৌজ পৌছান। কনৌজ হইতে তাঁহারা অযোধ্যায় আসেন। অযোধ্যা হইতে শ্রাবস্তী হইয়া তাঁহারা কপিলবস্তু আগমন করেন। কপিলবস্তু হইতে রামগ্রাম হইয়া তাঁহারা বুদ্ধের নির্বাণস্থান কুশীনগর বা কাসিয়া পৌছান। রামগ্রাম বর্তমানে পূর্বোত্তর রেলপথের গোরক্ষপুর-গোনডা শাখার মুণ্ডেরাওয়া

স্টেশন হইতে দুই মাইল দক্ষিণে রামপুর নামে পরিচিত একটি গ্রাম। কুশীনগর হইতে বৈশালী এবং তথা হইতে গঙ্গানদী অতিক্রম করিয়া তাঁহারা মগধের রাজধানী পাটলিপুত্র পৌঁছান। ফা-হিয়ান লিখিয়াছেন যে মগধের অধিবাসীরা সমৃদ্ধিশালী ও উদারহৃদয়। অপরকে সাহায্য দান এবং প্রতিবেশীদের প্রতি কর্তব্য পালনে ইহারা সদাই তৎপর। সমাজের নেতৃস্থানীয় ও ভদ্র জনসাধারণের অর্থানুকূল্যে রাজধানীতে বহু দাতব্য-চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠিত আছে। এখানে দরিদ্র ও অসহায় ব্যক্তিদের যত্ন লওয়া হয়। (১)

আশ্চর্যের বিষয় ফা-হিয়ান তাঁহার ভ্রমণ-বৃত্তান্তে কোথাও মগধের রাজার নাম উল্লেখ করেন নাই। গুপ্ত-রাজগণ ব্রাহ্মণ্য-ধর্মের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন, সনাতন হিন্দুধর্মের পুনরভ্যুত্থানের উদ্গাতা এই বিধর্মী রাজার নাম উল্লেখ করিয়া সম্ভবতঃ ফা-হিয়ান তাঁহাকে গৌরবান্বিত বা চিরস্মরণীয় করিতে চাহেন নাই। তথাপি মগধের সমৃদ্ধি বর্ণনায়, মগধবাসীর মহৎ চরিত্রের প্রশস্তিতে ফা-হিয়ানের অজ্ঞাতসারে পরোক্ষভাবে দ্বিতীয়-চন্দ্রগুপ্তের সুশাসন মহিমাই প্রকটিত হইয়া পড়িয়াছে। পাটলিপুত্র হইতে ফা-হিয়ান সদলে রাজগৃহ (রাজগীর) গমন করেন এবং তথা হইতে গয়া হইয়া বারণসী আগমন করেন। বারাণসী হইতে পাটলিপুত্রে পুনরাগমন করিয়া অতঃপর তাঁহারা তাম্রলিপ্ত (আধুনিক মেদিনীপুরের তমলুক) যাত্রা করেন। গঙ্গার মোহানায় অবস্থিত এই বন্দর-সহরে দুই বৎসর বাস করিয়া ফা-হিয়ান বৌদ্ধ-সূত্রগুলির অনুলিপি ও বৌদ্ধ-মূর্তি সমূহের প্রতিলিপি (ড্রইং) প্রস্তুত করেন। দুই বৎসর পর একটি বাণিজ্যপোতে স্থান সংগ্রহ করিয়া তাম্রলিপ্ত হইতে তিনি সিংহল যাত্রা করেন। সিংহল হইতে যবদ্বীপ হইয়া জলপথে ৪১১ খৃষ্টাব্দে ফা-হিয়ান চীনে প্রত্যাবর্তন করেন। মোট ছয় বৎসর কাল ফা-হিয়ান এদেশে অবস্থান করিয়াছিলেন। বুদ্ধের দেশ হইতে বিবিধ তথ্য ও জ্ঞানলাভ করার জন্য ফা-হিয়ান কয়েকজন সঙ্গীসহ এদেশে আসিয়াছিলেন। একস্থান হইতে আর এক স্থানে আসিতে পথের দুইধারে বৌদ্ধধর্ম ও ভগবান বুদ্ধ সংক্রান্ত যাহা কিছু দ্রষ্টব্য ও জ্ঞাতব্য সব কিছুই এই পরিব্রাজকেরা দেখিবার ও জানিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। এই জন্যই ভারত পরিক্রমণে তাঁহাদের এত দীর্ঘ সময় ব্যয়িত হইয়াছিল। ফা-হিয়ানের পরিক্রমণ পথের নূতন আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। পূর্ববর্তী অধ্যায়

(১) S. Beal—Travels of Fah-hian and Sung Yun, pp.-107

সমূহে বর্ণিত ও এতৎকালে সুপ্রচলিত পথগুলিই ফা-হিয়ান কর্তৃক ব্যবহৃত হইয়াছিল।

কবি কালিদাসের কাল সম্বন্ধে পণ্ডিতদের মধ্যে মতভেদ আছে। পণ্ডিত-প্রবর কীথের মতে (A. B. Keith) কালিদাস দ্বিতীয়-চন্দ্রগুপ্তের সমসাময়িক ছিলেন। কালিদাসের রচনাবলীর আভ্যন্তরীণ সাক্ষ্য হইতেও কীথের মতটি সমর্থিত হয়। কালিদাসের কাব্যে ভারতবর্ষের যে ভৌগোলিক ও সামাজিক পরিবেশ দেখিতে পাওয়া যায় তাহা সর্বতোভাবে গুপ্তসাম্রাজ্যের স্বর্ণযুগের—বিশেষভাবে দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের রাজত্বকালের (৩৮০ হইতে ৪১৩ খৃষ্টাব্দে) চিত্র।

কালিদাসের মালবিকাগ্নিমিত্র নাটকে দেখা যায় যে বিদর্ভরাজ মাধব সেন স্বীয় ভগ্নী মালবিকাকে বিদিশাধিপতি অগ্নিমিত্রের হস্তে সমর্পণের উদ্দেশ্যে যাত্রা করিয়া পথিমধ্যে শত্রু কর্তৃক আক্রান্ত হইয়া বন্দী হন। মাধবের মন্ত্রী সুমতি মালবিকাকে লইয়া বিদিশাগামী একদল বণিকের সঙ্গলাভ করেন (স ইমাং তথাগত ভ্রাতৃকাং ময়া সার্দ্ধমপবাহ্য ভবৎসম্বন্ধাপেক্ষয়া পথিকসার্থং বিদিশাগামিনমনুপ্রবিষ্টঃ।—মালবিকাগ্নিমিত্র, ৫।৮৩)। ইহা হইতে বিদর্ভ (বর্তমান বেরার অঞ্চল) হইতে বিদিশা (বর্তমান মধ্যপ্রদেশের ভিলসার নিকট অবস্থিত বেসনগর) অভিমুখে একটি বাণিজ্য-পথের ইঙ্গিত পাওয়া যাইতেছে।

রঘুবংশে রামসীতা প্রাসাদ শীর্ষে দাঁড়াইয়া দেখিতেছেন যে অধঃস্থিতা অযোধ্যানগরীর সুপ্রশস্ত রাজপথ সমূহের উভয় পার্শ্বে বিপণি শ্রেণীতে সহস্র সহস্র লোক ক্রয় বিক্রয়ের জন্য সমবেত হইয়া রাজধানী অযোধ্যাকে মুখরিত করিয়া তুলিয়াছে (ঋদ্ধাপনং রাজপথং ইত্যাদি, রঘু ১৪।৩০)। রঘুবংশে রামনন্দন কুশের সুশাসনের সাক্ষ্য হিসাবে লিখিত হইয়াছে যে তাঁহার অধিকারে বণিকেরা নদীসমূহে গৃহদীর্ঘিকার ন্যায়, বনসমূহে উপবনের ন্যায় এবং পর্বত সমূহে গৃহের ন্যায় যথেচ্ছ বিচরণ করিত (বাপীষ্বিব স্রবন্তীষু বনেষুপবনেষ্বিব। সার্থাঃ স্বৈরং স্বকীয়েষু চেরুর্বেশ্মস্বিবাদ্রিষু ।।—রঘু ১৭।৬৪)।

রঘুবংশে রাজপথ ব্যতীত, মার্গ, নরেন্দ্র মার্গ (৫।৪৯, ৬।৬৭) প্রভৃতি শব্দ দীর্ঘ প্রশস্ত পথ অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। কুমারসম্ভবে এই অর্থেই মহাপথ শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে (—কুমার ৭।৩)।

রঘুর দিগ্বিজয় প্রসঙ্গে দেখা যায় অযোধ্যা হইতে নিক্রান্ত হইয়া প্রাচ্যদেশ জয় করিতে করিতে রঘু সুহ্ম দেশ (পশ্চিম বঙ্গের দক্ষিণ রাঢ় অঞ্চল), তারপর

উৎকল হইতে সমুদ্রের বেলাভূমি অঞ্চল ধরিয়া অগ্রসর হইয়া পাণ্ড্যরাজ্য (বর্তমান তিনিভেলী, মাদুরা অঞ্চল), কেরল হইয়া পশ্চিমঘাট পর্বতমালা ধরিয়া পারস্য, কম্বোজ প্রভৃতি জয় করেন। অতঃপর কাশ্মীর ও হিমালয় সংলগ্ন অঞ্চল ধরিয়া তিনি প্রাগ্‌জ্যোতিষপুর (বর্তমান আসামের কামরূপ অঞ্চল) জয় করিয়া স্বরাজ্যে প্রত্যাবৃত্ত হন (রঘু—৪)। হরিসেনের সমুদ্রগুপ্ত প্রশস্তির সহিত রঘুর দিগ্বিজয় পথের আংশিক সাদৃশ্য থাকায় ঐতিহাসিকেরা মনে করেন যে রঘুর দিগ্বিজয় বর্ণনার উপর সমুদ্রগুপ্তের দিগ্বিজয়াভিযানের প্রভাব পড়িয়াছে। কালিদাসের মালবিকাগ্নিমিত্রে অশ্বমেধ যজ্ঞের যে উল্লেখ আছে, উহা কালিদাসের অনতিপূর্বকালে অনুষ্ঠিত সমুদ্রগুপ্তের অশ্বমেধযজ্ঞের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। রঘুবংশে রঘুপুত্র অজের ভোজরাজ্যে (বেরার) গমন পথটি, কালিদাসের কালে অযোধ্যা হইতে দক্ষিণগামী একটি পথের ইঙ্গিত সূচিত করে (৪।৪১ রঘু)।

এই প্রসঙ্গে কালিদাসের মেঘদূত কাব্যের মেঘের গতিপথটিও আলোচনা করা যাইতে পারে। মেঘদূত-নায়ক যক্ষের নির্বাসন স্থানটি ছিল—'রামগিরি'। উইলসনের মতে নাগপুর রেলওয়ে স্টেশন হইতে ২৪ মাইল উত্তর পশ্চিমে অবস্থিত রামটেক শহরের নিকট এই নামীয় পাহাড়টিই মেঘদূতের রামগিরি। মারাঠী ভাষায় রামগিরি ও রামটেক্ সমার্থক। মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর মতে বর্তমান মধ্যপ্রদেশের সরগুজা জেলার রামগড়ই কালিদাস বর্ণিত রামগিরি। এই রামগিরি হইতে মেঘের গন্তব্য ছিল উত্তর দিকে মালক্ষেত্র (ক্ষেত্রমারুহ্যমালং ১।১৬)। এই মালক্ষেত্র দ্বারা মালোয়ার কৃষ্ণবর্ণ উচ্চভূমি বুঝান হইয়াছে। অতঃপর পর্বতের ঢালুভূমিতে আম্রকূটের কথা আছে। ইহা দ্বারা রেওয়া রাজ্যের সাতপুরা পর্বতমালার পূর্বোত্তর দিকে অবস্থিত অমরকণ্টক স্থানটিই সম্ভবতঃ বুঝাইতেছে। কারণ পরেই বলা হইতেছে যে এই স্থান হইতেই বিন্ধ্য পাদমূল দিয়া প্রবাহিতা শীর্ণা রেবানদী (নর্মদা) দেখা যায় (রেবাদ্রক্ষ্যস্যুপল বিষমে বিন্ধ্যপাদে বিশীর্ণাং ২।১৯)। এখানে উল্লেখযোগ্য যে রেবা (নর্মদা) অমরকণ্টক পর্বতশীর্ষ হইতে উৎপন্ন হইয়া বিন্ধ্যপাদমূল ধরিয়া প্রবাহিত। অতঃপর মেঘের গন্তব্য স্থান 'পরিণত ফলশ্যাম জম্বুবনান্তাঃ দশার্ণা' (১২৪)। পুরাণে দশার্ণ জনপদের উল্লেখ আছে। পূর্বমালব অঞ্চল লইয়া এই জনপদ গঠিত ছিল। প্রাচীন কালের দশার্ণের রাজধানী বিদিশা নগরী (বর্তমান মধ্যপ্রদেশের ভিল্‌সার নিকট অবস্থিত বেস্‌নগর) পৌঁছিয়া মেঘকে 'নীচৈ' পাহাড়ে বিশ্রাম লইয়া বেত্রবতী নদীর তীরে পুষ্পবনে যাইতে বলা হইয়াছে

(১।২৬)। উইলসনের মতে এই নদী বেতোয়া ও শিপ্রার মধ্যে প্রবহমানা 'পার্বতী' নামে একটি নদী। অতঃপর মেঘকে উজ্জয়িনী যাইতে বলা হইতেছে (১।২৮)। বিদিশা হইতে উজ্জয়িনী আকাশপথে বা স্থলপথে সরলরেখায় নহে। এই জন্যই মেঘকে কিছুটা বাঁকা ভাবে যাইতে অনুরোধ করা হইয়াছে। উজ্জয়িনী ছাড়িয়া গম্ভীরা নদী (শিপ্রার শাখা নদী) পার হইয়া মেঘের গন্তব্য স্থল দেবগিরি, এই দেবগিরিতে স্কন্দ দেবতার মন্দির আছে বলা হইয়াছে (১।৪২-৪৩)। চম্বল নদীর দক্ষিণ ভাগে দেবগিরি নামে মাত্র ২০০ ফিট উঁচু একটি পাহাড় আছে। এখানে এখনও খাণ্ডেরা দেবতার একটি মন্দির আছে। 'খাণ্ডেরা'-স্কন্দরাজ শব্দের চলিত রূপ হওয়াই সম্ভব। অতঃপর চম্বল বা চর্মন্বতী পার হইয়া মেঘকে একটু বাঁকিয়া উত্তর মুখে দশপুর যাইতে বলা হইয়াছে (১।৪।)। দশপুরের বর্তমান নাম মন্দাসোর, মধ্যপ্রদেশের গোয়ালিয়র জেলায় সিউনা নদীর তীরে এইস্থান অবস্থিত। এই স্থান হইতে মেঘের গন্তব্য সরস্বতী ও দৃষদ্বতী নদীর মধ্যবর্তী ব্রহ্মাবর্ত জনপদ (১ ৪৭)। এই জনপদের কুরুক্ষেত্র হইতে সরস্বতী নদী পার হইয়া মেঘকে হরিদ্বারের দুই মাইল পূর্বে অবস্থিত কনখলে যাইতে বলা হইয়াছে। অতঃপর হিমালয় পর্বতে আরোহণ করিয়া ক্রৌঞ্চরন্ধ্র গিরিপথ ধরিয়া কৈলাস মেঘের গন্তব্যস্থল। কৈলাস ও মানস সরোবর যাইতে হইলে মাঙ্গাং, লংপ্যা, ধর্মা, উনধাওরা, কিংরিবিংরি, বাল্চা, সালসাল্, সিলিকাঙ্, নিতি প্রভৃতি অনেকগুলি গিরিপথ আছে (১)। মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের মতে এই ক্রৌঞ্চ-রন্ধ্রই নিতি গিরিপথ (Mountain Pass) (২)।

মহাভারতের দ্রোণপর্বে লিখিত হইয়াছে যে ক্রৌঞ্চ পক্ষীসকল এই পথ দিয়া মানস সরোবরে পৌঁছায়। সুপ্রসিদ্ধ সুইডিশ পর্যটক সভেন্ হেডিন্ (Sven Hedin) বর্তমান শতাব্দীর প্রথম দিকে হিমালয় অঞ্চলে পরিভ্রমণ করেন—এই ক্রৌঞ্চ-রন্ধ্র হইয়া হংসমালার কৈলাস অভিমুখে যাতায়াত তিনিও লক্ষ্য করিয়াছেন। ক্রৌঞ্চরন্ধ্র পার হইয়া মেঘকে কৈলাস ও মানস সরোবর হইয়া অলকা পুরীতে যাইতে বলা হইয়াছে (৫৮-৭০)।

---

(১) S. G. Bernard and H. H. Hayden,—A sketch of the Geography and Geology of the Himalayan Mountains and Tibet—p. 92.

(২) Journal of the Bihar and Orissa Research Society—Vol. I, Pt. II, p. 202.

পর্যটক সভেন্ হেডিন্ এই অঞ্চল পরিভ্রমণ করিয়া কালিদাসের বর্ণনার সহিত এই অঞ্চলের ভৌগোলিক সাদৃশ্য সমর্থন করিয়াছেন (১)। কৈলাস পর্বতের স্থানীয় নাম তিব্বতীয় ভাষায় কাং রিন পোচে (৮০° ২৮′ পূ: ও ৩১° উ:)। ইহার উচ্চতা ২১,৮১৮ ফিট। মানস-সরোবর কৈলাসের ঈষৎ দক্ষিণে পূর্ব দিক ঘেঁষিয়া অবস্থিত (৮১°৩০′ পূ: ও ৩০°১০′ উ:)। এই হ্রদ সমুদ্র পৃষ্ঠ হইতে ১৫,০৯৮ উচ্চে অবস্থিত। এই হ্রদের দক্ষিণ ভাগে গুর্লা মানডাটা (Gurla Mandatta) নামে একটি পর্বত আছে। দেখা যাইতেছে কবি কালিদাস ভারতের ভূগোল সম্বন্ধে বিশেষ অভিজ্ঞ ছিলেন (২)।

মৌর্য যুগের অবসানের কয়েক শতাব্দীর মধ্যেই গুপ্ত-যুগে ভারতের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত পথাবলী শরীরের শিরা-উপশিরার ন্যায় সুবিন্যস্ত হইয়া গিয়াছিল।

---

(১) Sven Hedin—Trans.-Himalaya—discoveries and adventures in Tibet, London, 1913, Vol. II, pp. 110-11, 189; Vol. III, p. 116, 193.

(২) H. C. Chakladar—The Geography of Kalidasa—Indian Studies : Past and Present, Vol. IV, No 4, pp. 454-457.

অষ্টম অধ্যায়

পথ পরিচয়—কান্যকুব্জ সাম্রাজ্যের যুগ

গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতনের পর উত্তর ভারতে কনৌজের মৌখরী বংশ ও স্থানেশ্বরের পুষ্যভূতি বংশ প্রবল হইয়া উঠে। স্থানেশ্বররাজ প্রভাকর বর্ধনের পর তৎপুত্র রাজ্যবর্ধন স্থানেশ্বরের সিংহাসন লাভ করেন। মৌখরি-রাজবংশীয় গ্রহবর্মা প্রভাকরবর্ধনের কন্যা রাজ্যশ্রীর পাণিগ্রহণ করেন। গৌড়রাজ শশাঙ্কের সহিত সংঘর্ষে গ্রহবর্মা ও রাজ্যবর্ধনের মৃত্যুর পর এই উভয় রাজ্যের শাসনভার রাজ্যবর্ধনের ভ্রাতা হর্ষবর্ধনের হস্তগত হয়। আনুমানিক ৬০৬ খৃষ্টাব্দে হর্ষবর্ধন সিংহাসনে আরোহণ করেন। কনৌজ এই যুক্ত রাজ্যের রাজধানী হয়। হর্ষবর্ধন প্রায় অর্ধশতাব্দী কাল (৬০৬—৬৪৭ খৃষ্টাব্দ) প্রবল পরাক্রমে রাজত্ব করেন। পাঞ্জাবের পূর্বাঞ্চল, বর্তমান উত্তর প্রদেশ, বিহার, উড়িষ্যা এবং সম্ভবতঃ বাঙ্গলার কিয়দংশ তাঁহার সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। হর্ষবর্ধনের রাজত্বকালে পাটলিপুত্রের গৌরব ম্লান হইয়া যায়, কনৌজ তদানীন্তন ভারতের প্রাণকেন্দ্র হইয়া উঠে।

হর্ষবর্ধনের রাজত্বকালে চৈনিক পরিব্রাজক হিউএন্ সাঙ্ (Hiuen Tsang, Yuan Chawang) বৌদ্ধধর্ম সম্বন্ধে সবিশেষ জ্ঞান লাভের জন্য ভারতে আগমন করেন। হিউএন্ সাঙের ভ্রমণ বৃত্তান্ত তদানীন্তন ভারতের ইতিহাস রচনার এক অমূল্য উপকরণ।

চীনের কানশু প্রদেশ হইতে গোবি মরুভূমি, সমরকন্দ, ব্যাকৃট্রিয়া (বাহ্লীক, উত্তর আফগানিস্তান) ও হিন্দুকুশ পর্বত অতিক্রম করিয়া হিউএন্ সাঙ্ গান্ধার রাজ্যে প্রবেশ করেন। ৬৩০ খৃষ্টাব্দে হিউএন্ সাঙ্ পুরুষপুর (পেশোয়ার) আগমন করেন। এখান হইতে কাবুল নদী পার হইয়া তিনি তক্ষশিলা পৌছান। তক্ষশিলা হইতে তিনি কাশ্মীর যাত্রা করেন। তক্ষশিলা তৎকালে কাশ্মীর রাজ্যভুক্ত ছিল। তক্ষশিলা হইতে কাশ্মীর যাইবার পথের নদীগুলির উপর লৌহনির্মিত সেতু ছিল। বরাহমলপুরা (আধুনিক বরমুলা) হইয়া হিউএন্ সাঙ্ কাশ্মীরের রাজধানী প্রবরপুর (শ্রীনগর) পৌছান। কাশ্মীররাজ মহাসমারোহে তাঁহার অভ্যর্থনা করেন। ৬৩১—৩২ খৃষ্টাব্দ এই দুই বৎসর কাশ্মীরে বাস করিয়া বহু মূল্যবান বৌদ্ধগ্রন্থ অধ্যয়ন ও সংগ্রহ করিয়া চৈনিক

পরিব্রাজক ভারতের সমতলভূমি অভিমুখে যাত্রা করেন। প্রথমে তিনি পাঞ্জাবের শাকল (বর্তমান শিয়ালকোট) নগরে পৌছেন। হিউএন্ সাঙের ভ্রমণ বিবরণে দেখা যায় যে শাকল হইতে পূর্বে পথে সর্বত্র বহু পান্থশালা ছিল। এখানে অনাথ আতুরদের বিনামূল্যে ভোজ্য ও ঔষধ বিতরণ করা হইত, পথিকদের কোন কষ্ট হইত না। শাকল হইতে হিউএন্ সাঙ্ সম্ভবতঃ বর্তমান লাহোরে আসেন। এখান হইতে তিনি বিপাশা তীরে অবস্থিত চীনভুক্তি, জলন্ধর হইয়া মথুরায় পৌছান। মথুরা ত্যাগ করিয়া যমুনানদীর উজানপথ ধরিয়া তিনি স্থানীশ্বর (বর্তমান থানেশ্বর) আসেন। স্থানীশ্বর হইতে আধুনিক দেরাদুন, হরিদ্বার, গাড়োয়াল, পশ্চিম রোহিলখণ্ড, অহিচ্ছত্র, সঙ্কিসা (সঙ্কাশ্য-বর্তমান বেরিলীর নিকট) হইয়া তিনি কান্যকুব্জ বা কনৌজ পৌছান। হিউএন্ সাঙ্ যখন কান্যকুব্জ (উত্তর প্রদেশের ফারুখাবাদ জেলায়) আসেন তখন মহারাজ হর্ষবর্ধন কান্যকুব্জে উপস্থিত ছিলেন না। কান্যকুব্জ হইতে অযোধ্যা-প্রয়াগ হইয়া হিউএন্ সাঙ্ কৌশাম্বী আসেন (এলাহাবাদের নিকটবর্তী আধুনিক কোশাম গ্রাম)। কৌশাম্বী হইতে শ্রাবস্তী (আধুনিক সাহেত মাহেত) হইয়া চৈনিক পরিব্রাজক ভগবান বুদ্ধের জন্ম ও নির্বাণস্থান কপিলবস্তু ও কুশীনগর দর্শন করেন। এখান হইতে বারাণসী, বৈশালী (মজঃফরপুর শহরের কুড়ি মাইল দক্ষিণ পশ্চিমে অবস্থিত আধুনিক বসার গ্রাম) হইয়া তিনি নালন্দায় আগমন করেন। অল্পকালের জন্য রাজগৃহ দেখিয়া আসিয়া তিনি দীর্ঘকাল নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ শীলভদ্রের নিকট বৌদ্ধ ধর্মশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। নালন্দা হইতে পাটলিপুত্র হইয়া তিনি বুদ্ধগয়ায় আগমন করেন। গয়া হইতে চম্পা (ভাগলপুর), চম্পা হইতে কজঙ্গল (আধুনিক বিহারের রাজমহল), কজঙ্গল হইতে পৌণ্ড্র বর্ধন (বর্তমান বাংলা দেশের বগুরা জেলার মহাস্থান) হইয়া হিউএন্ সাঙ্ কামরূপ (আসামের গৌহাটি অঞ্চল) আগমন করেন (১)। কামরূপ হইতে সমতট (ত্রিপুরা ও নোয়াখালি জেলা অঞ্চল) অতিক্রম করিয়া তিনি তাম্রলিপ্ত (আধুনিক মেদিনীপুর জেলার তমলুক) আগমন করেন। ফা-হিয়ানের মত

(১) এই যাত্রায় হিউএন্ সাঙ্ কামরূপ আসেন নাই, পরে আসিয়াছিলেন—অনেক লেখকের এইরূপ মত। এই অনুচ্ছেদে সাধারণ ভাবে Thomas Watters-এর মত অনুসৃত হইয়াছে। (On Yuan Chawang's Travels in India—Thomas Watters. Royal Asiatic Society, London, 1904.)

তাম্রলিপ্ত হইতে জলপথে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করাই তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল। জলপথে বিপদের সম্ভাবনা আছে জানিয়া হিউএন্ সাঙ্ তাঁহার এই সঙ্কল্প ত্যাগ করেন। তাম্রলিপ্ত হইতে কর্ণসুবর্ণ (পশ্চিম বঙ্গের বহরমপুরের নিকট চিরুটি রেলওয়ে স্টেশনের সন্নিহিতস্থান) হইয়া তিনি ওড্র ও কলিঙ্গ (আধুনিক ওড়িশা) অভিমুখে যাত্রা করেন। কলিঙ্গ হইতে দক্ষিণ কোশল (রায়পুর, বিলাসপুর সম্বলপুর অঞ্চল) এবং প্রায় দুইশত মাইল অরণ্য পথ দিয়া তিনি অন্ধ্ররাজ্যে আসেন (পশ্চিম গোদাবরী জেলা)। অতঃপর অমরাবতী (গুন্টুর জেলা), নাগার্জুন কোণ্ডা প্রভৃতি পর্যটনান্তে পরিব্রাজক কোনার নদীতীরে পল্লবরাজের অধীন দক্ষিণ কর্ণাটের কাঞ্চীতে (আধুনিক কাঞ্জীভরম্, চিঙ্গেলপুট জেলা) উপস্থিত হন। সিংহল যাওয়াই তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল, কিন্তু সিংহলে গৃহযুদ্ধ ও দুর্ভিক্ষের সংবাদ পাইয়া তিনি সিংহল যাত্রার সঙ্কল্প পরিত্যাগ করিয়া কোঙ্কন ও মহারাষ্ট্র প্রদেশে উপস্থিত হন। কোনও কোনও লেখকের মত এই যে তিনি সিংহল গিয়াছিলেন।

মহারাষ্ট্র হইতে মালব, মালব হইতে গুজরাটের বলভী (কাথিয়াওয়ারের ভবনগরের নিকট বর্তমান নাম ব্বালা) ও সুরাট হইয়া হিউএন্ সাঙ্ পাঞ্জাবের মূলতান পর্যন্ত অগ্রসর হন। এখান হইতে তিনি পুনরায় তাঁহার প্রিয় শিক্ষাতীর্থ নালন্দায় প্রত্যাগমন করেন। এখানে কিছুকাল অবস্থিতির পর সম্রাট্ হর্ষবর্ধনের সাদর আমন্ত্রণে তিনি তাঁহার সহিত মিলিত হইবার জন্য কান্যকুব্জ যাত্রা করেন। হর্ষের নিকট হইতে প্রচুর সমাদর লাভ করিয়া প্রয়াগ-কৌশাম্বী হইয়া তিনি স্বদেশের উদ্দেশে পাঞ্জাব অভিমুখে যাত্রা করেন। সিন্ধুনদী অতিক্রম করিয়া তিনি উডিয়ান, উদভাণ্ড, নগ্রহার (জালালাবাদ) ও লম্পকের (জালালাবাদের কুড়ি মাইল উত্তর পশ্চিমে অবস্থিত) মধ্য দিয়া কপিশা (কাবুল নদীর তীরে) আগমন করেন। কপিশার রাজার নিকট বিদায় লইয়া হিউএন্ সাঙ্ হিন্দুকুশ পামীর হইয়া কাশগর উপনীত হন। কাশগর হইতে ইয়ারকন্দ ও খোটান হইয়া ৬৪৫ খৃষ্টাব্দে হিউএন্ সাঙ্ চীনের চাঙ-আন্ সহরে পৌছান। এখানকার রাজা মহাসমারোহে তাঁহাকে অভ্যর্থনা জানান। এইরূপে হিউএন্ সাঙের ষোল বর্ষব্যাপী বিংশ সহস্র মাইল পরিব্রজন সমাপ্ত হয়। হিউএন্ সাঙ্ নিজের প্রয়োজন ও ইচ্ছামত ভারতবর্ষের একস্থান হইতে আর একস্থানে ভ্রমণ করিয়াছিলেন। মৌর্য ও গুপ্তযুগের প্রচলিত পথগুলি হিউএন্ সাঙ্ নিঃসন্দেহে ব্যবহার করিয়াছিলেন। অপেক্ষাকৃত অজ্ঞাত

স্থানগুলিতে যাইবার সময় অবশ্যই তাঁহাকে বনজঙ্গল, নদী পর্বত অতিক্রম করিয়া যাইতে হইয়াছিল। হিউএন্ সাঙের ভারত ভ্রমণের বহু পূর্বেই যে ভারতের প্রতিটি রাজ্য ও জনপদ সুপ্রশস্ত পথাবলী দ্বারা পরস্পরের সহিত সংযুক্ত হইয়া গিয়াছিল ইহা পূর্ববর্তী অধ্যায়গুলিতে দেখান হইয়াছে।

হর্ষবর্ধনের মৃত্যুর পর তাঁহার সাম্রাজ্য বিনষ্ট হইয়া যায়। কনৌজের আধিপত্য লাভের জন্য বাঙ্গলার পাল রাজবংশ, দাক্ষিণাত্যের রাষ্ট্রকূটবংশ ও গুজরাটের প্রতিহারবংশের ত্রিমুখী-সংঘর্ষে অবশেষে গুর্জর প্রতিহারেরাই জয়ী হন। মহেন্দ্র পাল (৮৯০—৯১০) এই বংশের একজন পরাক্রান্ত রাজা ছিলেন। মহেন্দ্র পালের সাম্রাজ্য হর্ষবর্ধনের সাম্রাজ্য হইতে বিস্তৃততর ছিল। গুর্জর প্রতিহারেরা সুশাসক ছিলেন।

আচার্য শঙ্কর বা শঙ্করাচার্য ভারত-ইতিহাস ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে একজন স্মরণীয় পুরুষ। ভারতের জনমানসে তাঁহার চিন্তাধারার প্রচুর প্রভাব রহিয়াছে। আচার্য শঙ্কর তাঁহার স্বল্পায়ু জীবনে অদ্বৈতবাদ প্রচারার্থে সমগ্র ভারত পরিভ্রমণ করেন। তাঁহার কীর্তি পরিমাণে বিপুল হইলেও তাঁহার ব্যক্তিজীবন সম্বন্ধে অতি অল্প তথ্যই পাওয়া যায়। সম্ভবতঃ ইনি ৭৮৮ খ্রীষ্টাব্দে কেরল রাজ্যের কালাডি নামক গ্রামে নম্বুদ্রি-ব্রাহ্মণ কুলে জন্মগ্রহণ করেন। অল্প বয়সে পিতৃহীন হওয়ার পর তিনি সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ করেন। নর্মদাতীরে আচার্য গোবিন্দপাদের শিষ্যরূপে থাকিয়া কিছুদিন পর তিনি বারাণসী যান ও তথায় কিছু কাল বাস করেন। ২৫ বৎসর বয়সে তিনি বারাণসী, প্রয়াগ, রুদ্রপুর, মাহিষ্মতী হইয়া মহারাষ্ট্রের মধ্য দিয়া তুঙ্গভদ্রা নদীর উৎসমুখে শৃঙ্গেরি (কর্ণাটক)-পৌছিয়া সেখানে একটি মঠ স্থাপন করেন। এই স্থান হইতে তিনি মাতাকে দর্শন করিতে কালাডি আসেন ও মাতার মৃত্যুর পর পূর্ব উপকূল ধরিয়া নানাস্থানে ভ্রমণ করেন—এই সময় তিনি পুরীতে গোবর্দ্ধন মঠ নামে একটি মঠ স্থাপন করেন। অতঃপর তিনি কাঞ্চী আসেন (কাঞ্চী ভরম, তামিলনাড়ুর চিঙ্গেলপুট জেলা) ও একটি মঠ প্রতিষ্ঠা করেন। শৃঙ্গেরি ফিরিয়া সেখান হইতে তিনি উজ্জয়িনী ও পরে বারাণসী আসেন। বারাণসী হইতে পশ্চিম দিকে দ্বারকা পৌছিয়া সেখানেও তিনি একটি মঠ প্রতিষ্ঠা করেন। দ্বারকা হইতে তিনি কাশ্মীর যান। কাশ্মীর হইতে তিনি ভারতের পূর্ব প্রান্ত কামরূপ পর্যন্ত গমন করেন। বারাণসী হইতে

শঙ্কর বহুবার বদ্রীনাথ গিয়াছিলেন। এখানেও তিনি এক সময়ে একটি মঠ স্থাপন করেন। কামরূপ হইতে তিনি বদ্রীনাথ প্রত্যাবর্তন করেন এবং এই স্থান সন্নিহিত কেদারনাথে মাত্র ৩২ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করেন। অদ্বৈত-বেদান্ত প্রচার ও বিপক্ষগণকে স্বপক্ষে আনয়নই ছিল শঙ্করের সমগ্র ভারত পরিভ্রমণের উদ্দেশ্য। ভারতের চারিপ্রান্তে চারিটি মঠ স্থাপন করিয়া আচার্য শঙ্কর ভারতবাসীকে অখণ্ড ভারত-চেতনায় উদ্বুদ্ধ করিয়া গিয়াছেন সন্দেহ নাই (১)।

(১) Indian Inheritance, Bharatiya Vidya Bhaban, Vol. I, pp. 218-224.

নবম অধ্যায়

পথ পরিচয়—হিন্দুরাজত্বের অবসান কাল

অষ্টম শতাব্দীর প্রথম দিকে মহম্মদ বিন্ কাশিম সিন্ধুদেশ অধিকার করেন। হিন্দুরাজ-শক্তির প্রবল প্রতিরোধের ফলে বিশেষতঃ গুর্জর প্রতিহার রাজাদের শৌর্যে দীর্ঘকাল মুসলমান শাসন ভারতবর্ষের অন্যান্য ভূখণ্ডে বিস্তৃত হইতে পারে নাই। কনৌজের পতনের পর হিন্দুরাজগণের সংহতির অভাব ও অন্তর্দ্বন্দ্বের সুযোগে গজনীর রাজা সবুক্তগীনের পুত্র মামুদ একাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে পুনঃ পুনঃ ভারত আক্রমণ ও লুণ্ঠন করিতে থাকেন। এইরূপে ভারতে মুসলমান শাসনের সূত্রপাত হয়। প্রাচীন ভারতের ইতিহাসের পরিধি মুসলমানশাসনের পূর্বকাল পর্যন্ত বিস্তৃত। মুসলমান-শাসনকাল ভারতেতিহাসের মধ্যযুগ। মধ্যযুগ আমাদের বর্তমান আলোচনার বহির্ভূত।

সিন্ধুদেশ বিদেশী মুসলমান শক্তি দ্বারা বিজিত হওয়ার পর আরবের সহিত ভারতবর্ষের বিশেষতঃ সিন্ধু-অঞ্চলের সংযোগ দৃঢ় হয়। ইহার ফলে বহু মুসলমান পর্যটক নবম-দশম-একাদশ শতাব্দীতে ভারতে আগমন করিতে থাকেন। ইহাদের অনেকে তাঁহাদের ভারত ভ্রমণের অভিজ্ঞতা লিপিবদ্ধ করেন। এই সব ঐতিহাসিক বা ভৌগোলিকদের নাম আবু জায়দু (Abu Zaidu), ইব্‌ন খুরদাবা (Ibn Khurdaba), আল্ মাসুদি (Al Masudi), আল্ ইস্টাখরি (Al Istakhri), ইব্‌ন হাউকাল (Ibn Haukal), আল্‌বেরুণী (Al Beruni) প্রভৃতি। এই বিদেশী পর্যটকদের রচনায় ভারতবর্ষের নানাস্থানের বিবরণ ও পথের পরিচয় আছে (১)। এই সমস্ত লেখকদের রচনায় তথ্যের অনেক ভুল-ত্রুটিও লক্ষ্য করা যায়। ইহার মধ্যে আল্‌বেরুণীর ভারত বিবরণ তাঁহার সমসাময়িক বিদেশী লেখকদের দোষ-ত্রুটি হইতে মুক্ত। আল্‌বেরুণী ভারত বিবরণ ব্যতীত প্রাচীন ভারতের জ্ঞান বিজ্ঞান সম্বন্ধেও বহু পুস্তক রচনা করেন। ঐতিহাসিকদের মতে আল্‌বেরুণীর ভারত-বিবরণ বিশেষ নির্ভরযোগ্য প্রামাণিক গ্রন্থ।

---

(১) দ্রষ্টব্য—Elliot's History of India—Ed. by Prof. John Dowson (Vols.—1-8), London, 1877.

আল্‌বেরুণী (অন্য নাম আবু রেইহান—Abu Raihan) একজন বিখ্যাত গণিতজ্ঞ ও জ্যোতির্বিদ্ ছিলেন। রুশীয় তুর্কীস্থানের খিবা নামক রাজ্যে ৯৭৩ খৃষ্টাব্দে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। গজনীর অধিপতি মামুদ খিবা আক্রমণ করিলে তথাকার রাজসভাসদ্ আল্‌বেরুণী বন্দীরূপে ১০১৭ খৃষ্টাব্দে গজনীতে নীত হন। অতঃপর আল্‌বেরুণী গজনীতেই স্থায়ীভাবে বাস করিতে থাকেন। একজন অসাধারণ পণ্ডিত হিসাবে অচিরেই তিনি দেশের একজন গণ্যমান্য ব্যক্তি হইয়া উঠেন। মামুদকে আল্‌বেরুণী সম্ভবতঃ বিশেষ শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিতেন না, তাঁহার রচনাবলীর মধ্যে তিনি কুত্রাপি মামুদের সুখ্যাতি করেন নাই। সম্ভবতঃ তিনি মামুদের অনুগ্রহপ্রার্থীও ছিলেন না। মামুদপুত্র মাসুদ আল্‌বেরুণীর অনুরাগী ও পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। হিন্দুদর্শন ও শাস্ত্র ও ভারতবর্ষ সম্বন্ধে আল্‌বেরুণীর রচিত গ্রন্থাদিতে তাঁহার উদার, নিরপেক্ষ ও সত্যদৃষ্টির পরিচয় পাওয়া যায়। আল্‌বেরুণী নিজে ভারত ভ্রমণ করিয়াছিলেন, এতদ্ব্যতীত ভারত ও আফগানিস্তানের মধ্যে বাণিজ্যরত পর্যটক বণিকশ্রেণী ও মামুদের ভারতাভিযান প্রত্যাগত সৈন্য প্রভৃতির নিকট হইতেও তিনি তাঁহার ভারত বিবরণ গ্রন্থের ('তাহকি কাতল হিন্দ'—ভারতবর্ষ সম্বন্ধে সত্যানুসন্ধান) উপাদান সংগ্রহ করিয়াছিলেন। আল্‌বেরুণী তাঁহার এই পুস্তক সম্বন্ধে লিখিয়াছেন যে "ইহা শুধু তথ্যের ঐতিহাসিক ভিত্তিতে রচিত।"

আনুমাণিক ১০৩৮ খৃষ্টাব্দে রচিত আল্‌বেরুণীর পুস্তকে ভারতের যে বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে উহা ভারতে হিন্দুশাসনের শেষ অধ্যায়ের প্রতিরূপ বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে—কারণ পুস্তক রচনার কালে মুসলমান শাসনকালের সূচনা হইয়াছে মাত্র, হিন্দুশাসনকালের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাষ্ট্রিক কাঠামোটি তখনও সম্পূর্ণরূপে লয় প্রাপ্ত হয় নাই। এই সময়ে কাশ্মীর, গুর্জর, মালব এমন কি মামুদ কর্তৃক আক্রান্ত কনৌজ রাজ্যেও হিন্দুশাসন অব্যাহত ছিল।

আল্‌বেরুণীর গ্রন্থে ভারতের নিম্নবর্ণিত ষোলটি ভ্রমণ-পথের (itinerary) উল্লেখ আছে। পুস্তকে কনৌজকে (বর্তমান উত্তরপ্রদেশের ফারুখাবাদ জেলায়) ভারতের কেন্দ্রস্থল বলিয়া ধরা হইয়াছে।

(১) কনৌজ হইতে দক্ষিণমুখে এলাহাবাদ (প্রয়াগ), তথা হইতে পূর্ব উপকূল হইয়া কাঞ্চী (কাঞ্জীভরম্) এবং আরও দক্ষিণ অঞ্চল।

(২) কনৌজ হইতে পূর্বমুখে বারী হইয়া অযোধ্যা, বারাণসী এবং তথা হইতে পূর্বমুখে পাটলিপুত্র, মুঙ্গের, চম্পা (ভাগলপুর) হইয়া গঙ্গার মোহানা গঙ্গাসাগর পর্যন্ত। বারী আগ্রার নিকট একটি স্থান, মামুদের কনৌজ আক্রমণের পর এই স্থানে রাজধানী সাময়িকরূপে স্থানান্তরিত হয়।

(৩) কনৌজ হইতে বারী, তথা হইতে বিহাট (আধুনিক বিহার রাজ্যের বেতিয়া)—ত্রিহুত—কামরূপ (আসাম)। ত্রিহুতের উত্তরে নেপাল রাজ্য। এখান হইতে ভোটেশ্বর (ভুটান) ৩০০ মাইল দূরে অবস্থিত ছিল।

(৪) কনৌজ হইতে দক্ষিণ-পূর্বে গঙ্গার পশ্চিমকূলে যাযাহুতি রাজ্য (বুন্দেলখণ্ডের যাঝোতি)। খাজুরাহো এই দেশের রাজধানী। কনৌজ ও খাজুরাহোর মধ্যে গোয়ালিয়র ও কালঞ্জর (বান্দা জেলা) নামক স্থানে দুইটি দুর্গ আছে। এই স্থান হইতে কালচুরি ও গাঙ্গেয়দের রাজধানী ত্রিপুরী (জব্বলপুর) হইয়া কর্ণাটক দেশের অন্তর্ভুক্ত সমুদ্রোপকূলবর্তী 'বনবাস' যাওয়া যায়। (এই স্থানটি কর্ণাটকের উত্তর কানাড়া জেলায় অবস্থিত, ইহা এক সময়ে কদম্ব বংশীয়দের রাজধানী ছিল।

(৫) কনৌজ হইতে দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে অসি। অসি হইতে রাজৌরি হইয়া (রাজোরগড়-আলোয়ার) বাজানা (ভরতপুর অঞ্চলের বায়ানা), বাজানা হইতে নারায়ণ (সম্ভবতঃ মাড়ওয়ারের ভিনমাল)।

(৬) কনৌজ হইতে মথুরা—দুধাহি (ঝাঁসী জেলায় ললিতপুরের নিকট)—ভিল্‌সা—উজ্জয়িনী ও উজ্জয়িনী হইতে মালব-রাজধানী ধার।

(৭) বাজানা হইতে প্রায় ৯৩ মাইল দূরে মেবারের রাজধানী চিতোর। চিতোর হইতে মালবের রাজধানী ধার ৭৫ মাইল দূরে অবস্থিত।

(৮) ধার হইতে উজ্জয়িনী প্রায় ২৭ মাইল পূর্বে অবস্থিত। ধার হইতে দক্ষিণমুখে নর্মদা তীর ধরিয়া গোদাবরী তীরস্থ মন্দাগির পৌঁছান যায়।

(৯) ধার হইতে দক্ষিণমুখে মহারাষ্ট্র (কোঙ্কন অঞ্চল) দেশ হইয়া সমুদ্র-তীরস্থ থানা বন্দর।

(১০) বাজানা হইতে দক্ষিণ-পশ্চিম মুখে অনহিলবাড় (গুজরাত, বর্তমান পটন) হইয়া পশ্চিম উপকূলে সোমনাথ (কাথিয়াওয়াড়)।

(১১) অনহিলবাড় হইতে দক্ষিণমুখে লাট দেশের সমুদ্রোপকূলবর্তী বিরোচ্‌ (ভারুকচ্ছ, বরোচ্‌) ও রিহান্‌জুর (নওসারি)।

(১২) বাজানা হইতে পশ্চিমমুখে মুলতান-ভাটি হইয়া দক্ষিণ-পশ্চিম মুখে সিন্ধু নদীর মোহানায় লোহারানী (করাচির নিকট)। লোহারানী—আরব শাসনাধীন সিন্ধুপ্রদেশের সহরের তদানীন্তন নাম।

(১৩) কনৌজ হইতে উত্তর-পশ্চিম মুখে সিরসা (হিসার জেলা)—দাহ্‌মাল—ভাল্লাওয়ার হইতে পশ্চিম-মুখে লাড্ডা, লাড্ডা হইতে রাজগিরি (রাজোরি) হইয়া কাশ্মীরে পৌছান যায়।

(১৪) কনৌজ হইতে পশ্চিম মুখে মীরাট, পানিপথ (কর্ণাল জেলা) আটক, পেশোয়ার, কাবুল হইয়া গজনী (গজনা) পর্যন্ত (সুলতান মামুদের আক্রমণ পথ) যাওয়া যায়।

(১৫) সিন্ধু ও বিতস্তা (ঝিলম) নদীর মাঝামাঝি স্থানে অবস্থিত বব্রহান হইতে উস্কর (প্রাচীন হুবিষ্কপুর) হইয়া কাশ্মীরের তৎকালীন রাজধানী অধিষ্ঠান পর্যন্ত যাওয়া যায়।

(১৬) আফগানিস্তানের দক্ষিণে সিন্ধুর মাকরান প্রদেশের রাজধানী তিজ হইতে দেবল (অনেকের মতে এই শহরই আধুনিক করাচী)। দেবল হইতে লোহারাণী, কচ্ছ, সোমনাথ, ক্যাম্বে, বরোচ, সোপারা, থানা, কাঞ্চী হইয়া সেতুবন্ধ রামেশ্বর পর্যন্ত যাওয়া যায় (১)।

এ যাবৎ প্রাক্‌বৈদিক যুগ হইতে হিন্দুরাজত্বের শেষ অধ্যায় পর্যন্ত যে পথ পরিচয় দেওয়া হইয়াছে তাহাতে উত্তর ভারতের আলোচনাই প্রাধান্য লাভ করিয়াছে, ভারতের পূর্বাঞ্চল ও দক্ষিণাঞ্চলের কথা বিশেষভাবে আলোচিত হয় নাই। এই জন্য পরবর্তী অধ্যায়ের একটিতে দক্ষিণাপথ ও অপরটিতে বাঙ্গালা ও আসামের পথ প্রসঙ্গ আলোচিত হইবে।

---

(১) **E. C. Sachau—Alberuni's India, Vol. I (Chap. XVIII), London, 1910, p. 200**

দশম অধ্যায়

পথ পরিচয়—দক্ষিণ-ভারত

ভূতাত্ত্বিকদের মতে ভারতের দক্ষিণভাগ ইহার উত্তরাংশ অপেক্ষা বহু প্রাচীন। সম্ভবতঃ ইহা জগতের প্রাচীনতম ভূখণ্ড। হিমালয় পর্বত ও সমগ্র আর্যাবর্ত যখন সমুদ্রগর্ভান্তর্গত ছিল তখনও দাক্ষিণাত্য ভূভাগের অস্তিত্ব ছিল। পণ্ডিতেরা বলেন যে এক সময়ে এই ভূভাগ স্থলপথে পূর্বে চীন, ব্রহ্মদেশ ও পশ্চিমে আফ্রিকা মহাদেশের সহিত সংযুক্ত ছিল, পরে ভারত-সমুদ্র এই ভূভাগকে তাহার পূর্ব-পশ্চিম অংশ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া দিয়াছে।

ভারতে আর্যসভ্যতা বিস্তারের পূর্ব হইতেই যে দক্ষিণাপথ সমৃদ্ধ দেশ ছিল ইহার প্রমাণ পাওয়া যায়।

স্মরণাতীত কাল হইতে উত্তর ভারতের সহিত দক্ষিণ ভারতের যোগাযোগ ছিল। অনেক পণ্ডিত মনে করেন যে দ্রাবিড়েরা ভারতের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল হইতে দক্ষিণাপথে গিয়া তথায় বসবাস আরম্ভ করেন।

সিন্ধু সভ্যতার ধ্বংসাবশেষের মধ্যে যে সব মণি ও স্বর্ণ পাওয়া গিয়াছে সেগুলি যথাক্রমে নীলগিরি ও মহীশূর-কোলারের খনিজাত বলিয়া জানা গিয়াছে। সিন্ধুসভ্যতার কেন্দ্রগুলির সহিত দক্ষিণাপথের এই সব স্থানের স্থলপথে বাণিজ্যিক যোগাযোগের কথা পূর্বেও আলোচিত হইয়াছে (১)।

---

(১) দ্রষ্টব্য—"Both Northern and Southern India were connected in those days by ties of brisk trade. It is necessary to draw up a complete picture of this ancient commerce which built up the Indus civilization and of the roads of traffic by which the Nilgiris could send their supply of green stone and Hazaribagh their tins to distant cities like Harappa and Mohenjodaro. The North and the South had been from the dawn of civilization bound together in the ties of intimate commerce and cultural intercourse which circumvented the suppossed barrier of the Vindhyas or forest like Dandakaranya. It must have been along these ancient ways of intercourse that the Dravidians travelled from the north to the south. It was these that made possible the intensive movements of pre-historic times". —R. K. Mookerji—Hindu Civilization, pt. I, pp. 39-40.

বৈদিক যুগের দুঃসাহসী বণিকেরা (পনি) দাক্ষিণাত্যের সমুদ্রোপকূলে সপ্ত-সিন্ধু দেশের উৎপন্ন দ্রব্য লইয়া গিয়া তথায় বিক্রয় করিয়া আসিত।

বৈদিকোত্তর যুগের মহাকালপথ ছিল উত্তর-দক্ষিণের মধ্যে বাণিজ্য-পথ। কৌটিলীয় অর্থশাস্ত্রে মহাকালপথকে সমধিক গুরুত্ব দেওয়া হইয়াছে। বৌদ্ধ, মৌর্য ও গুপ্ত যুগে দক্ষিণাপথের সহিত উত্তরাপথের সংযোগ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। মৌর্য হইতে গুপ্ত এবং গুপ্ত-পরবর্তী যে কোন পরাক্রান্ত উত্তর ভারতীয় নরপতির উচ্চাভিলাষের লক্ষ্য ছিল দক্ষিণ বিজয়। উত্তরাপথের একাধিক নৃপতি দক্ষিণ ভারতের উপর প্রভুত্ব বিস্তার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। অপরদিকে দাক্ষিণাত্যের নৃপতিরাও উত্তর ভারতের রাজচক্রবর্তীত্ব লাভের সাধনায় আত্মনিয়োগ করিতে যত্নবান ছিলেন।

রামায়ণে লিখিত আছে যে অগস্ত্য ঋষি বিন্ধ্য অতিক্রম করিয়া দাক্ষিণাত্যে গমন করিয়াছিলেন এবং তিনি আর তথা হইতে প্রত্যাবর্তন করেন নাই। বৈদিক সভ্যতা বিস্তারই ছিল অগস্ত্যের দক্ষিণ যাত্রার উদ্দেশ্য। অধ্যাপক য়্যাকোবির মতে খৃঃ পূঃ ষষ্ঠ শতাব্দীতে রামায়ণ রচিত হয়। অগস্ত্য নিশ্চয়ই এই সময়ের বহু পূর্বেই দক্ষিণ যাত্রা করিয়াছিলেন।

অগস্ত্যের কিছুকাল পরে উত্তর ভারত বা গাঙ্গেয় উপত্যকা হইতে ভেল নামে একটি বংশ বা সম্প্রদায় দ্বারকা হইতে দক্ষিণ ভারতের তামিলনাডে উপস্থিত হয় ও তথায় বসবাস আরম্ভ করে। এই ভেল জাতির উত্তর ভারত হইতে দক্ষিণ ভারতে আগমনের সাক্ষ্য নানা কিংবদন্তী হইতে পাওয়া যায়। ভেল জাতি ভেল্লার নদী উপত্যকায়, আধুনিক তিরুচিরাপল্লী ও তাঞ্জোর অঞ্চলে বসবাস স্থাপন করে। খৃষ্ট জন্মের কয়েক শতাব্দী পূর্ব হইতেই ভেল জাতির বিভিন্ন শাখা কয়েক শতাব্দী ধরিয়া দাক্ষিণাত্যের বিভিন্নস্থানে রাজত্ব করিয়াছিল। পরবর্তী কালে ভেল জাতির মধ্যে বহু দক্ষ রণনায়ক জন্মগ্রহণ করেন। দক্ষিণা-পথের উচ্চাভিলাষী নৃপতিগণের রাজ্য বিস্তারে এই ভেল রণনায়কেরা বিশিষ্ট অংশ গ্রহণ করেন। প্রাচীন সঙ্গম (তামিল) সাহিত্যে কডুম্বালুরের ইরুকু-ভেলদের নানা গৌরবের কাহিনী লিপিবদ্ধ রহিয়াছে। কডুম্বালুরে ভেলজাতির অতীত সমৃদ্ধির অনেক ধ্বংসাবশেষ পাওয়া যায়, পদুকোটা হইতে ২৫ মাইল দূরে অবস্থিত এই স্থানটি বর্তমানে একটি ক্ষুদ্র গ্রাম।

জনশ্রুতি এই যে গাঙ্গেয় উপত্যকার রাক্ষস (আর্যেতর কোন জাতি) উপদ্রুত ভেলজাতি দ্বারকায় শ্রীকৃষ্ণের আশ্রয়-প্রাপ্ত হয় ও তথা হইতে তাহারা

দাক্ষিণাত্যে আসিয়া বসতি স্থাপন করে। ভেলেরা শ্রীকৃষ্ণকে তাহাদের পূর্বপুরুষ বলিয়া মনে করে। দ্বারকা হইতে ভেলদের দক্ষিণ-আগমন যে জনশ্রুতি মাত্র নহে, দ্বারকা হইতে বর্তমান তামিলনাড়ু রাজ্যের কডুম্বালুর পর্যন্ত ভেলনামাঙ্কিত স্থান গুলির উপর দৃষ্টিপাত করিলে ইহা বেশ বুঝা যায়। এই স্থানগুলির মধ্য দিয়াই ছিল ভেল জাতির দক্ষিণ-গমন পথ। ক্রমানুসারে গমন পথটির ইহাই আনুমানিক রূপ—দ্বারকা হইতে প্রতিষ্ঠান বা পৈঠান। পৈঠান হইতে ভেলারপুরম (আহমদাবাদ তালুক), ভিলুর (বর্তমানে ইলোরা, ঔরঙ্গাবাদের নিকট), ভেলাগাম (মহারাষ্ট্রের পুনা জেলায়), ভেলাপুরম্ (সোলাপুর বিভাগ, মহারাষ্ট্র), ভেলাহিস্তি (অন্ধ্র প্রদেশ), ভেলাগম পড়ু (কালাহস্তী জেলা), ভেলভেনেরু, (গুন্টুর জেলায়, বর্তমান নাম ভেলপুরু), ভেলমাকুরু (অনন্তপুর জেলা), ভেলাকুরুচি, (কুডাপ্পা জেলা, অন্ধ্র প্রদেশ), ভেলেরু (উত্তর আর্কট)—পেরু ভেলুর (তাঞ্জোর জেলা), কিল ভেলুর, পুলিরুকুভেলুর ও কোড়ুম্বালুর (তামিলনাড়ু রাজ্যের ভেলভেডাডি পদুকোটার নিকট)। যে নদীর তীরে ভেলেরা বসতি স্থাপন করে সেই নদীটিও কালে আপন নাম হারাইয়া ভেলার নামে পরিচিত হইয়াছে। গোদাবরীর দক্ষিণ তীর হইতে নেলোর পর্যন্ত ভুভাগ এখনও ভেলাণ্ডু নামে অভিহিত, ইহা হইতে দক্ষিণাপথের জনমানসে উত্তর-ভারতাগত ভেল জাতির অনপনেয় প্রভাবের পরিচয় পরিস্ফুট হইতেছে (১)।

হ্যাভেলের মতে আর্যাবর্ত হইতে দক্ষিণ ভারতে যাত্রার পথ অবন্তী রাজ্যের মাহিষ্মতী, বিদ্ধারণ্য ও পৈঠানের মধ্য দিয়া প্রসারিত ছিল। গোদাবরীর তীরভূমি দিয়া রাইচুর (আধুনিক অন্ধ্র প্রদেশ) এবং চিত্রলদ্রুগ (আধুনিক কর্ণাটক রাজ্য) হইয়া এই পথ মাদুরা পৌছাইত (২)। প্রাচীন ভেল জাতি ও অগস্ত্য ঋষি অল্পবিস্তর এই পথ অনুসরণ করিয়াই দাক্ষিণাত্যে উপস্থিত হন বলিয়াই মনে হয়।

বৌদ্ধ সাহিত্যে উত্তর-ভারতের মথুরা হইতে সমুদ্রোপকূল ধরিয়া তিনিভেলীর (কেরল) নিকটস্থ একটি বন্দর-শহর পর্যন্ত প্রসারিত একটি পথের উল্লেখ আছে। সিংহল-দেশীয় বৌদ্ধগ্রন্থ মহাবংশে মহারাষ্ট্র হইতে মালবদেশের অভ্যন্তর দিয়া দক্ষিণ মুখে বিসর্পিত একটি সুবিস্তৃত পথেরও উল্লেখ পাওয়া যায়।

(১) Dr. M. Arokiaswami—The Early History of the Vellar Basin—Madras, 1924, pp. 38-9.

(২) E. B. Havell—The history of Aryan Rule in India—pp 21, 129-30.

অশোক-লিপি হইতে দেখা যায় যে দাক্ষিণাত্যের চোল, পাণ্ড্য ও কেরল পর্যন্ত ছিল মৌর্য সাম্রাজ্যের বিস্তৃতি। অশোক নিজে কলিঙ্গ ব্যতীত কোন দেশ জয় করেন নাই। সম্ভবতঃ চন্দ্রগুপ্ত স্বয়ং অথবা তৎপুত্র বিন্দুসার মৌর্য সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা কালে এই সব রাজ্য জয় করিয়াছিলেন।

মৌর্য-সৈন্য মহারাষ্ট্র ও মহীশূরের মধ্য দিয়া একদিকে তিরুকোভিলুর হইয়া চোল রাজ্যের এবং আর একদিকে পাণ্ড্য রাজ্যের মধ্য দিয়া পশ্চিমঘাট পর্বত-মালার পাদদেশ ধরিয়া পডিইল গিরি পর্যন্ত অগ্রসর হয়। পশ্চিমঘাট পর্বতমালা ধরিয়াই সম্ভবতঃ মৌর্য-সৈন্য তামিল রাজ্যে প্রবেশ করিয়াছিল (১)।

খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীর শেষ ভাগে একজন মিশরবাসী গ্রীক্-নাবিকের লিখিত বিবরণ হইতে দাক্ষিণাত্যের পথ-ঘাটের নানা বিবরণ পাওয়া যায়। বইখানি "The Periplus of Erythrean Sea" নামে ইংরাজীতে অনূদিত ও প্রকাশিত হইয়াছে (২)। Periplus কথাটির অর্থ ভ্রমণকারীর নক্সা (Hand Book)। ভারতমহাসাগর গ্রীক্ ও রোমান্ ভৌগোলিকদের নিকট তৎকালে Erythrean sea নামে পরিচিত ছিল। এই বিবরণে লিখিত আছে যে পূর্বদিকে অবস্থিত Ozene (উজ্জয়িনী) হইতে রপ্তানী ও আন্তর্বাণিজ্যের জন্য দ্রব্য-সমূহ Barygaza-তে নীত হইত। এই Barygaza নর্মদা নদীর মোহনায় সৌরাষ্ট্র উপকূলে অবস্থিত বরোচ্ (প্রাচীন নাম ভারুকচ্ছ); উত্তরে অবস্থিত কাশ্মীর, হিন্দুকুশ ও কাবুল অঞ্চল হইতেও দ্রব্যসম্ভার রপ্তানীর জন্য এখানে আনীত হইত। Periplus-এর বিবরণ অনুযায়ী Barygaza হইতে উপকূল-ভাগ উত্তর-দক্ষিণ মুখে সরল রেখায় প্রসারিত ছিল, ইহার নাম ছিল Dachinabades (দক্ষিণাপথ)। এই দক্ষিণ দেশের একটি প্রধান বাণিজ্যকেন্দ্র ছিল পৈঠান। ইহা বর্তমান মহারাষ্ট্র রাজ্যের ঔরঙ্গাবাদ জেলায় অবস্থিত ছিল। Paethan(পৈঠান) হইতে দশদিনের পথে পূর্বদিকে অবস্থিত ছিল Tagara (আধুনিক টের, ওসমানাবাদ জেলা, অন্ধ্রপ্রদেশ), পৈঠান হইতে টেরের দূরত্ব ৯৫ মাইল; পেরিপ্লাসের লেখক দশ মাইলকে একদিনের পথ ধরিয়াছেন দেখা যাইতেছে। (স্যর জন ক্যাম্পবেল ও জে. এফ্. ফ্লীটের মতে দক্ষিণাপথের পুরাকালীন বাণিজ্যপথের একটি প্রান্ত

(১) S. K. Aiyangar—The Beginnings of South Indian History, pp, 101, 136. 139.

(২) W. H. Schoff (tr.)—The Periplus of the Erythrean Sea.

ছিল মসলিপত্তন (১)। দ্বিতীয় পথ ছিল ভিনুকোণ্ডা হইতে হায়দ্রাবাদের দক্ষিণ-পূর্ব অঞ্চল, পৈঠান—দৌলতাবাদের মধ্য দিয়া নাসিক জেলার মারকিণ্ডা পর্যন্ত (২)। অন্ধ্র রাজাদের সময়ে এই পথের শেষ স্বাভাবিক সীমা ছিল বোম্বাই-এর নিকট কল্যাণ বন্দর। গুজরাটের শক রাজাদের বাধা সৃষ্টির জন্যই কল্যাণ বন্দরের ব্যবহার পরিত্যক্ত হয় এবং পর্বতমালার মধ্য দিয়া ভূভাগে এই পথকে সুদূর Barygaza বা বরোচ্ পর্যন্ত প্রসারিত রাখা হয়)। Periplus-এ দেখা যায় যে পৈঠান, Damirica (তামিল রাজ্য) প্রভৃতি স্থান হইতে সাধারণ বস্ত্র, মসলিন প্রভৃতি Barygaza-তে রপ্তানীর জন্য আনা হইত। পেরিপ্লাসে লিখিত হইয়াছে যে বারিগাজার পর এই অঞ্চলের প্রসিদ্ধ বাণিজ্য কেন্দ্র সুপ্পারা (Suppara, সূর্পারক, মহারাষ্ট্রের থানা জেলায় আধুনিক সোপারা)। অতঃপর ক্যালিয়েনার নাম আছে (Calliena, থানা জেলার কল্যাণ)। পেরিপ্লাসেও বলা হইয়াছে যে রাজনৈতিক কারণে এই বন্দরের গুরুত্ব কমিয়া গিয়াছে। গ্রীক্ জাহাজগুলি বর্তমানে এই স্থানের পরিবর্তে বারিগাজায় নোঙ্গর করে। কল্যাণের দক্ষিণে যথাক্রমে সেমিল্লা (বোম্বাই শহরের দক্ষিণে বর্তমান চাউল), মন্দাগোরা (সম্ভবতঃ আধুনিক ব্যাঙ্কোট), পালাই পটেমি (সম্ভবতঃ আধুনিক দাভোই), মেলিজিগারা (সম্ভবতঃ রত্নগিরি উপকূলে জয়গড়), বাইজান্টিয়াম (সম্ভবতঃ আধুনিক ভিজাদ্রগ) টোগারাম (আধুনিক দেওগর) ও টুরান্নোবোয়াস (সম্ভবতঃ আধুনিক মালভান) প্রভৃতি বাণিজ্যকেন্দ্রের নাম উল্লেখ আছে। অতঃপর কয়েকটি বিচ্ছিন্ন দ্বীপের উল্লেখ করিয়া বাকী বাণিজ্য-কেন্দ্রগুলির বিষয় আলোচিত হইয়াছে। এই দ্বীপগুলির পর নওরা (Naura) ও টিণ্ডিস্ (Tyndis) নামে দুইটি ব্যবসায় কেন্দ্রের উল্লেখ করা হইয়াছে। নওরা বর্তমানে কান্নানোর নামে পরিচিত। টিণ্ডিস্ সম্ভবতঃ আধুনিক কাডালুণ্ডি অথবা পোন্নানি। এই অঞ্চলের অপর দুইটি সমৃদ্ধ স্থান ছিল মুজিরিস্ (Mujiris, আধুনিক কাঙ্গানোর) ও নেলসিণ্ডা (Nelcynda, আধুনিক কোট্টায়াম সন্নিহিত)। টিণ্ডিস্ হইতে মুজিরিসের দূরত্ব ছিল ৫০ মাইল। নেলসিণ্ডা পাণ্ড্য রাজ্যভুক্ত ছিল। মুজিরিস বন্দরটি সর্বদা আরব ও গ্রীক্ দেশাগত বা ঐ দেশগামী জাহাজে বোঝাই থাকিত। নেলসিণ্ডার পর আর একটি

(১) Sir John Campbell—Gazeteer of the Bombay Presidency, Vol. XVI, p. 181.

(২) K. Gopalachari,—Early History of the Andhra country, Madras, 1941, p. 101,

বন্দর ছিল বেকারে (Bacare); সম্ভবতঃ বর্তমান আলেপ্পির নিকট পাণ্ড্যরাজ্য-ভুক্ত পোড়াকাডে ইহা অবস্থিত ছিল। পেরিপ্লাসে উল্লিখিত পরবর্তী বন্দরের নাম বালিটা (সম্ভবতঃ আধুনিক বরকাকালাই)। এই স্থানে একটি উত্তম পোতা-শ্রয় ছিল। পেরিপ্লাসে অতঃপর কুমারী অন্তরীপের বর্ণনা আছে, বলা হইয়াছে ইহা একটি তীর্থস্থান। কুমারিকা হইতে পূর্ব দিকে ছিল কোলকি (বর্তমান কোরকোই, টুটিকোরিনের নিকট)। এই স্থানটি মুক্তা-আহরণ কেন্দ্ররূপে বর্ণিত হইয়াছে। ইহাও পাণ্ড্য রাজ্যভুক্ত ছিল। কোলকির পর প্রসিদ্ধ স্থানের নাম অরগরু (উরগপুর আধুনিক তিরুচিরাপল্লীর নিকট), ইহাও ছিল একটি মুক্তা-আহরণ কেন্দ্র। এই স্থানের পর ক্রম অনুযায়ী প্রসিদ্ধ বাণিজ্য কেন্দ্র ছিল কামরা (সম্ভবতঃ আধুনিক কারিকলের নিকট কাবেরী পত্তন), পডুকা (বর্তমান আরকিয়ামাডু, পণ্ডিচেরীর নিকট) ও সোপাত্মা (Sopatma, আধুনিক মাদ্রাজ শহরের নিকট)। এই অঞ্চলগুলিসংলগ্ন ছিল মসালিয়া (আধুনিক মসলিপত্তন), এখানে মস্‌লিন বস্ত্র পাওয়া যাইত। এই স্থান হইতে উপকূল পূর্বাভিমুখী বলা হইয়াছে। এই দিকে যাত্রা করিলে দোসারিন অঞ্চলে যাওয়া যাইত (তোসালি—কলিঙ্গের প্রাচীন রাজধানী)। এই স্থানের হস্তি-দন্ত প্রসিদ্ধ ছিল। 'পেরিপ্লাস'এ এই স্থান হইতে পূর্বমুখে সমুদ্র পথে যাত্রা করিলে গাঙ্গে দেশ পাওয়া যায় বলা হইয়াছে।

এই গাঙ্গে বন্দর হইতে চিরসি (Chyrse, সুবর্ণভূমি বা জাভা-সুমাত্রা) যাওয়া যায়। গাঙ্গের নিকট গঙ্গা নামে নদী সমুদ্রে পড়িয়াছে। গাঙ্গে (গঙ্গা) বন্দর হইতে মশলা, গন্ধদ্রব্য, তাম্র, চন্দন কাষ্ঠ, মসলিন, রেশমী বস্ত্র, পশুচর্ম, গজদন্ত প্রভৃতি আরব ও আফ্রিকার উপকূলে রপ্তানী হইত। গাঙ্গে দেশের উত্তরে চীন দেশ উল্লিখিত হইয়াছে। অনেকে মনে করেন যে 'পেরিপ্লাস' ও অন্যান্য গ্রীক্ ঐতিহাসিক উল্লিখিত গাঙ্গে বা গঙ্গাবন্দর শহরটি প্রাচীনকালের তাম্রলিপ্ত বন্দর (বর্তমান মেদিনীপুরের তমলুক)। তাম্রলিপ্ত যে একটি আন্তর্জাতিক বন্দর শহর ছিল—চৈনিক পরিব্রাজকদের বিবরণে ও এমন কি তদপেক্ষাকৃত প্রাচীনতর বৌদ্ধ সাহিত্যের সাক্ষ্য হইতেও তাহা সমর্থিত হয়। তবে ইহা নিশ্চিত যে তাম্রলিপ্ত কোন সময়েই সমুদ্রোপকূলে অবস্থিত ছিল না। গঙ্গা অথবা গঙ্গার কোন শাখানদী দ্বারা ইহা সমুদ্রের সহিত সংযুক্ত ছিল। প্রাচীন সপ্তগ্রাম অথবা আধুনিক কলিকাতা বন্দরের সহিত যে ভাবে বঙ্গোপসাগরের জলপথে যোগাযোগ ছিল বা আছে, তাম্রলিপ্তের সহিত

বঙ্গোপসাগরের যোগাযোগ সেই ভাবে প্রতিষ্ঠিত ছিল বলিয়া মনে হয়। তাম্রলিপ্ত-পার্শ্ববর্তী নদী-খাত শুষ্ক হইয়া যাওয়াতে এই স্থানটি বন্দর হিসাবে পরিত্যক্ত হইয়াছিল।

কোন কোন পণ্ডিত অনুমান করেন যে তাম্রলিপ্ত ব্যতীত গঙ্গার মোহানায় গঙ্গা নামে একটি বন্দর-শহরও ছিল (১)। টলেমি গঙ্গা-বন্দর ও তাম্রলিপ্ত উভয়েরই পৃথক ভাবে উল্লেখ করিয়াছেন, সুতরাং গঙ্গা-বন্দরকে তাম্রলিপ্ত মনে করা হয়ত সঙ্গত নহে। "পুরুষোত্তম পুরী" এই যুগ্ম নামযুক্ত স্থানটি শুধু পুরী নামেই খ্যাত। কেহ কেহ উহাকে শুধু পুরুষোত্তমও বলিয়া থাকেন। বাংলার সাধারণ লোকে গঙ্গা-সাগর তীর্থযাত্রা কালে বলিয়া থাকে যে সাগরে যাইতেছি। গঙ্গা-সাগর এই নামটি হয়ত কখনও লোক মুখে শুধু গঙ্গা নামেই অভিহিত ছিল—গ্রীক্ ঐতিহাসিকেরা হয়ত এই জন্যই শহরটি বুঝাইতে শুধু 'গঙ্গা' লিখিতেন। শ্রীকৃষ্ণ প্রতিষ্ঠিত দ্বারকাপুরী সমুদ্রগর্ভে বিলীন হইয়া যাওয়ার ঘটনাটি স্মরণ রাখিলে ইহা অনুমান করা যাইতে পারে সে সুপ্রাচীন গঙ্গানগরী হয়ত অনুরূপ ভাবে সমুদ্রগর্ভে বিলীন হইয়াছে। কোন সময়ে "ফ্রেণ্ড অফ্ ইণ্ডিয়া" পত্রিকায় একটি বিবরণে প্রকাশিত হইয়াছিল যে ১৮৪১ খ্রীষ্টাব্দেও গঙ্গা-সাগরে কপিল মুনির একটি প্রস্তর নির্মিত মন্দির ছিল। এই মন্দিরে ৪০০।৫০০ বৎসর পূর্বেকার একটি শিলালিপিও সংযুক্ত ছিল। ১৮৪২ খ্রীষ্টাব্দে এই মন্দির ও সংলগ্ন লোকালয় সমুদ্রের জলোচ্ছ্বাসে সলিল সমাধি লাভ করে (২)। গঙ্গা-সাগর নামক স্থানটি বর্তমানে জন-অধ্যুষিত নহে বলিয়া কোন কালে এখানে কোন সমৃদ্ধ জনপদ বা বন্দর নগর ছিল না ইহা মনে করা সঙ্গত নহে। গঙ্গা-বন্দর বিনষ্ট হওয়ার পর তাম্রলিপ্তের গুরুত্ব বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছিল এমনও হইতে পারে।

অশোকের মৃত্যুর পর মৌর্যরাজগণের দুর্বলতার সুযোগে খ্রী: পূ: ৩৭ অব্দ হইতে ২১৮ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত সাতবাহন বংশীয় নরপতিগণ দাক্ষিণাত্যে প্রবল পরাক্রমে রাজত্ব করেন। গোদাবরী তীরবর্তী পৈঠান বা প্রতিষ্ঠান ইঁহাদের রাজধানী ছিল। সাতবাহন রাজাদের সময়ে ব্যবসায় বাণিজ্যের প্রভূত উন্নতি হয়। পশ্চিম দেশ হইতে বিপণিসম্ভারে পূর্ণ পোতগুলি বরোচ্, সোপারা

(১) D. C Sarkar—Studies in the Geography of Ancient and Mediæval India, p. 182.

(২) Journal of the Royal Asiatic Society of Bengal, 1850, p. 538.

ও কল্যাণ বন্দরে যাতায়াত করিত। টাগারা (টের) ও পৈঠান হইতে বরোচ্ পর্যন্ত পেরিপ্লাসে যে পথের উল্লেখ আছে ঐ পথ কৃষ্ণা গোদাবরীর 'ব' দ্বীপে অবস্থিত অসংখ্য পথের সহিত সংযুক্ত ছিল। বহু পথের অবস্থিতি হেতু দাক্ষিণাত্যের এক অংশ হইতে অপর অংশে গমনাগমন সহজ-সাধ্য ছিল। এই পথগুলির সহায়তায় শুধু ব্যবসায় বাণিজ্যের নহে দক্ষিণাপথের শিল্প-সংস্কৃতিরও শ্রীবৃদ্ধি সাধিত হইয়াছিল (১)।

সাতবাহন বংশের পতনের পর বিন্ধ্য ও গোদাবরী নদী সন্নিহিত অঞ্চলে বাকাটক, রাষ্ট্রকূট ও চালুক্য এবং সর্বদক্ষিণে পল্লব বংশীয় নরপতিগণ প্রবল হইয়া উঠেন।

সমুদ্রগুপ্তের দক্ষিণ-বিজয় প্রসঙ্গ পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। সমুদ্রগুপ্ত বর্তমান মধ্য প্রদেশের পূর্ব-দক্ষিণ প্রান্ত দিয়া ওড়িশায় প্রবেশ করেন। অতঃপর পূর্ব উপকূল ধরিয়া তিনি কাঞ্চী (বর্তমান কাঞ্জীভরম্) ও প্রাচীন চের রাজধানী বেঙ্গি (গোদাবরী অঞ্চলে, আধুনিক তিরু-কারুর) পর্যন্ত অভিযান করেন। ঐতিহাসিক কাশীপ্রসাদ জয়সোয়ালের মতে উত্তরাপথ হইতে অন্ধ্ররাজ্যে যাওয়ার প্রাচীন পথই সমুদ্রগুপ্ত অনুসরণ করিয়াছিলেন। বাঙ্গলা ও উড়িষ্যা হইতে অন্ধ্রে যাওয়ার অপর পথটি তিনি ব্যবহার করেন নাই (২)।

যুদ্ধবিগ্রহ উপলক্ষ্যে রাজাদের পক্ষে পথের প্রয়োজন অপরিহার্য। এই প্রসঙ্গে ইহা স্মরণীয় যে রাজারা সাধারণতঃ প্রচলিত পথগুলি যুদ্ধযাত্রায় ব্যবহার করিতেন, যেখানে পথ নাই সেখানেই শুধু পথ প্রস্তুত করিয়া লওয়া হইত। আধুনিক কালেও যুদ্ধের প্রয়োজনে বনজঙ্গল পাহাড়ের মধ্য দিয়া পথ নির্মাণের কথা সকলেরই সুবিদিত। যুদ্ধান্তে পথগুলি নষ্ট হইয়া যায় না, ইহা রাষ্ট্র ও জনসাধারণের প্রয়োজনে লাগে। গোদাবরী এমন কি গঙ্গার দক্ষিণ তীর হইতে কুমারিকা অন্তরীপের নিকটবর্তী কোটারু পর্যন্ত এইরূপ পথের পরিচয় দাক্ষিণাত্যের প্রাচীন ইতিহাস হইতে পাওয়া যায়।

পল্লব বংশীয় রাজাদের কালে রাজধানী কাঞ্চী (কাঞ্জীভরম্) হইতে তিরুচিরাপল্লী—তিরুক্কোভিলুর হইয়া একটি পথ ছিল। তিরুচিরাপল্লী

(১) K. A. Nilakanta Sastri, (Ed.)–A Comprehensive History of India (Vol. II),pp.—306-308.

(২) K. P. Jayaswal—History of India (150 A. D. to 350 A. D.)—p. 136.

(প্রাচীন নাম উরইয়ুর) হইতে পথটি আধুনিক পদুকোটার নিকটবর্তী কোদুম্বাই হইতে মাদুরা পর্যন্ত প্রসারিত ছিল। মাদুরার কিছু উত্তরে নেডুনগুলমে পথটি ত্রিভাগে বিভক্ত হইয়া মাদুরায় পুনর্মিলিত হইত। মাদুরা হইতে ভাইগাই (কাবেরীর উপনদী) নদীর উজান স্রোত ধরিয়া এই পথ আবার নিম্নাভিমুখী হইয়া পেরিয়ার নদীর গতিপথ ধরিয়া এই নদীর মোহানায় অবস্থিত চের রাজধানী বেঞ্জি (আধুনিক তিরুকারুর) পর্যন্ত প্রসারিত ছিল। এই স্থান হইতে তিরুক্কোভিলুর পর্যন্ত আর একটি পথেরও উল্লেখ পাওয়া যায় (১)।

চোল রাজাদের কালে (দশম-একাদশ শতাব্দী) রাজধানী তাঞ্জোর হইতে ভডুগাপ্পেরুবলী নামে অন্ধ্র রাজ্য পর্যন্ত বিস্তৃত একটি পথ ছিল। এই রাজ্য হইতে তাডিগাইনাডুর মধ্য দিয়া তাডিকাবলী নামে একটি ও কিনাবলী নামে পূর্বাঞ্চলগামী আর একটি পথের অস্তিত্ব ছিল। চোলরাজ্যের ভডুকাবলী, কিনাবলী পথ ব্যতীত আরও এই কয়েকটি দীর্ঘ পথের উল্লেখ পাওয়া যায়—(ক) কঙ্গু পর্যন্ত বিস্তৃত কোঙ্গাপেরুবলী, (খ) পেন্নাডাম পর্যন্ত বিস্তৃত পথ, (গ) তাঞ্জাভুরপ্পেরুবলী-কল্যাণপুর পথ। এই পথগুলি প্রায় ২৪ ফিট চওড়া হইত (২)।

খ্রীষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে চের রাজাদের দ্বিতীয় রাজধানী তোণ্ডি (রামনাদ জেলার পূর্বভাগে অবস্থিত) ছিল একটি বন্দর-শহর। এখান হইতে ভূভাগে গো-শকট দ্বারা বাণিজ্যসম্ভার দেশের অভ্যন্তরে নীত হইত। চোল রাজাদের দ্বিতীয় রাজধানী পুহরও একটি বন্দর শহর ছিল। এখান হইতেও দেশের অভ্যন্তর ভাগে যাইবার জন্য একটি পথ ছিল। পুহরের সমৃদ্ধি সম্বন্ধে সঙ্গম যুগের প্রসিদ্ধ গ্রন্থ পট্টিনাপ্পালাই গ্রন্থে বলা হইয়াছে যে এই শহরে সুদেহযুক্ত অশ্ব সকল জলযান দ্বারা আনীত হয়। শকট বোঝাই হইয়া মরিচ আসে। উত্তর অঞ্চলের পাহাড় হইতে আসে মণি ও স্বর্ণ। পশ্চিম পর্বত হইতে আসে অগুরু ও চন্দন। দক্ষিণ সমুদ্র হইতে আসে মুক্তা, পশ্চিম সমুদ্র হইতেও আসে মুক্তা। গঙ্গা উপত্যকা হইতে আসে নানা দ্রব্যসম্ভার। সিংহল ও মালয় উপদ্বীপ হইতে আসে বিবিধ খাদ্যবস্তু (৩)।

(১)—Dr. S. K. Ayyangar—Ancient India and South Indian History and Culture—Vol. I, pp. ৭০২, ৮০২-৮০৩.

(২) K. A. Nilkanta Sastri,—The Colas—Madras, 1955. p.594.

(৩) K. A. Nilakanta Sastri—The Colas, pp. 82-83.

উত্তর ভারতের সহিত দক্ষিণ ভারতের সংযোগ রক্ষাকারী কয়েকটি পথেরও উল্লেখ করা হইতেছে। ভারতীয় পুরাতত্ত্ব বিভাগের প্রতিবেদনে বারাণসী-প্রয়াগ হইতে রেওয়া রাজ্যের পার্শ্ব দিয়া অমরকণ্টক হইয়া সুদূর দক্ষিণ প্রান্তের রামেশ্বরগামী একটি পথের উল্লেখ আছে (৪)।

এই প্রতিবেদনে চুনার, বারাণসী, এলাহাবাদ, মধ্যভারত হইয়া কটক ও তথা হইতে রামেশ্বর পর্যন্ত আর একটি প্রাচীন পথ উল্লিখিত হইয়াছে। বলা বাহুল্য এই পথগুলি উত্তরভারত ও দক্ষিণভারতে প্রচলিত পথের মিলিত রূপ।

সপ্তম শতাব্দীতে হিউএন্ সাঙের দক্ষিণাপথ ভ্রমণের বিবরণ দেওয়া হইয়াছে, উহার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।

(৪) Report of Tours in South Eastern Provinces, Archæological Survey of India (1874-76) Vol, XIII—pp, 14-16.

একাদশ অধ্যায়

পথ পরিচয়—বাঙ্গলা ও আসাম

বেদে বঙ্গদেশের অথবা এতদ্দেশবাসীর উল্লেখ নাই। ইহা হইতে বুঝা যায় যে বৈদিক আর্যগণ বাঙ্গলার কথা অবগত ছিলেন না। পরবর্তী কালে লিখিত ঐতরেয় ব্রাহ্মণ (৭।১৮) ও ঐতরেয় আরণ্যকে (২।১।১) বঙ্গ মগধের উল্লেখ আছে। বৌধায়ন ধর্ম শাস্ত্রে (১।১।২১৩-১৫) পুণ্ড্র দেশ, পুণ্ড্র জাতি এবং পৃথক ভাবে বঙ্গ ও কলিঙ্গের উল্লেখ দেখা যায়।

বৈদিক-সাহিত্যে পূর্বাঞ্চলবাসীর প্রতি ঘৃণা ও তাচ্ছিল্যের যে ভাব লক্ষিত হয় পৌরাণিক সাহিত্যে তাহা অনুপস্থিত। বুঝা যায় যে এই সময়ে ধীরে ধীরে আর্যেরা বঙ্গ-মগধ-কলিঙ্গের সহিত পরিচিত হইতেছিলেন।

মহাভারতের তীর্থ-যাত্রা পর্বে লৌহিত্য ও করতোয়া তীর্থের উল্লেখ আছে। লৌহিত্য তীর্থে গমন করিলে বহু সুবর্ণ প্রাপ্ত হয়—করতোয়া তীর্থে গমন করিলে অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল লাভ হয় মহাভারতে ইহা লিখিত দেখা যায় (২।৮৪)।

উত্তর বঙ্গের করতোয়া ও ব্রহ্মপুত্রের (লৌহিত্য) তীরে কোন্ তীর্থ দুইটি বিশেষ ভাবে উল্লিখিত হইয়াছে তাহা বুঝা যায় না। এই অধ্যায়ে আরও বলা হইয়াছে যে, যে স্থানে গঙ্গা ও সাগরের সঙ্গম হইয়াছে তথায় অবগাহন করিলে অশ্বমেধ যজ্ঞের দশগুণ ফল প্রাপ্ত হয় (মহাভারত, ২।৮৫)।

মহাভারতের সভাপর্বে (২।২৫-৩২) দেখা যায় যে রাজ্যের শ্রীবৃদ্ধি নিমিত্ত দিগ্বিজয়ার্থে ভীম পূর্বদিকে, অর্জুন উত্তর দিকে, নকুল পশ্চিমে ও সহদেব দক্ষিণ দিকে গমন করিয়াছিলেন। ইন্দ্রপ্রস্থ (বর্তমান দিল্লী) হইতে বহুদেশ জয় করিয়া ভীম মগধে আসেন। গিরিব্রজ (রাজগীর) মোদ্গিরি (আধুনিক মুঙ্গের) জয় করিয়া ভীম পুণ্ড্র-বর্ধনাধিপতি (উত্তর বঙ্গ) বাসুদেবকে পরাজিত করেন। অতঃপর তিনি বঙ্গরাজ্যের (পূর্ব-দক্ষিণ ও পশ্চিম বাঙ্গলা) সমুদ্রসেন, চন্দ্রসেন, তাম্রলিপ্ত ও সুহ্ম অধিপতি (দক্ষিণ রাঢ়) ও ম্লেচ্ছগণকে পরাজিত করিয়া মহারাজ লৌহিত্যের (কামরূপাধিপতি ?) রাজ্যে আগমন করেন। বিজিত অথবা বশ্যতাপাশবদ্ধ রাজগণের নিকট হইতে বিবিধ রত্ন, চন্দন,

অগুরু, বস্ত্র, মণি, মৌক্তিক, কম্বল, স্বর্ণ, রৌপ্য প্রভৃতি সংগ্রহ করিয়া ভীম ইন্দ্রপ্রস্থ প্রত্যাগমন করেন।

যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞ সভায় (২।৩৪) ভারতের অন্যান্য রাজগণের সহিত পুণ্ড্রাধিপতি বাসুদেব ও বঙ্গরাজ আকর্ষকে উপস্থিত দেখা যায়।

ভীষ্মপর্বের জম্বুখণ্ড বিনির্মাণাধ্যায়ে (ভীষ্ম ৯) ভারতবর্ষের জনপদ সমূহের মধ্যে পুণ্ড্র ও নদীর মধ্যে করতোয়া ও লৌহিত্যের নাম দেখা যায়।

কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধক্ষেত্রে বঙ্গরাজ ও প্রাগ্‌জ্যোতিষাধিপ ভগদত্ত কৌরব পক্ষে যুদ্ধ করিয়াছিলেন। মহাবীর বঙ্গাধিপ দুর্যোধনকে হননোদ্যত ঘটোৎকচকে প্রতিহত করিয়া তাঁহাকে নিশ্চিত মৃত্যুর হাত হইতে রক্ষা করেন। দ্রোণপর্বে প্রাগ্‌জ্যোতিষরাজ ভগদত্তকে অপূর্ব বীরত্ব প্রদর্শনের পর অর্জ্জুন-কর্তৃক নিহত হইতে দেখা যায়। হরিবংশে পৌণ্ড্ররাজ বাসুদেবের দ্বারকা গমন ও শ্রীকৃষ্ণের সহিত যুদ্ধে নিহত হওয়ার বিবরণ আছে।

রামায়ণের কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডে দেখিতে পাওয়া যায় যে বানর-বাহিনী সীতা অন্বেষণে বঙ্গ, পুণ্ড্র ও মন্দারে প্রেরিত হইয়াছে (কিষ্কিন্ধ্যা ২৩, ২৫)। মন্দার সম্ভবতঃ পশ্চিমবঙ্গের মন্দারন অথবা ভাগলপুরের নিকটবর্তী মন্দার পর্বত।

মহাভারত ও রামায়ণের এই সব বিবরণ হইতে বুঝা যায় যে বাঙ্গলা ও আসাম হইতে উত্তরাপথে যাতায়াতের পথ এই সময়ে সুগম হইয়া আসিয়াছিল। কুরুক্ষেত্রযুদ্ধে বঙ্গরাজকে গজারূঢ় দেখা যায়, প্রাগ্‌জ্যোতিষপতিও তাঁহার বিরাট হস্তি-বাহিনী লইয়া কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে যোগদান করিয়াছিলেন। প্রচলিত পথ না থাকিলে বঙ্গ ও প্রাগ্‌জ্যোতিষরাজ হস্তিযূথ সহ সুদূর দিল্লীর নিকট (আধুনিক থানেশ্বর অঞ্চল) কুরুক্ষেত্রে পৌছিতে পারিতেন না।

জৈনগ্রন্থ আচারাঙ্গ সূত্রে (১) লাড় বা রাঢ়ের উল্লেখ আছে। জৈন প্রজ্ঞাপন,-উপাঙ্গে রাঢ় ও বঙ্গবাসীদের আর্য বলা হইয়াছে। বঙ্গের রাজধানী তাম্রলিপ্তি, লাঢ়ের রাজধানী কোটিবর্ষ (আধুনিক দিনাজপুর জেলার বাণগড়) এবং রাঢ়ের দুইভাগ সুহ্ম ও বজ্জভূমি বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। বৌদ্ধগ্রন্থ সমযুক্তনিকায় ও তেলপত্ত জাতকেও সুহ্মের উল্লেখ আছে। পাণিনিতে (খৃঃ পূঃ ৪-৫ শতাব্দী) বঙ্গের উল্লেখ নাই, গৌড়পুর আছে (৬।২।৯ ৯-১০০)। ভাষ্যকার পতঞ্জলি (খৃঃ পূঃ ২য় শতাব্দী) বঙ্গের উল্লেখ করিয়াছেন (৪।১।১৪,

---

(১) আচারাঙ্গ সূত্র (১।৮।৩) (S.B. E, Vol XI)

৪।২।১)। গ্রীক্ ঐতিহাসিকেরা (Gangaridai) জাতির উল্লেখ করিয়াছেন। তাঁহাদের বিবরণ হইতে বুঝা যায় যে নিম্ন গাঙ্গেয় উপত্যকার অধিবাসীদের তাঁহারা এই নামে চিহ্নিত করিয়াছেন (১)। খ্রীষ্টীয় ৭ম শতাব্দীতে দণ্ডী রচিত দশ-কুমার চরিতে (ষষ্ঠ উচ্ছ্বাস) তাম্রলিপ্তের অবস্থান সুহ্ম দেশে বলা হইয়াছে (২)।

গ্রীক্ ঐতিহাসিক স্ট্র্যাবো খ্রীষ্টীয় প্রথম শতাব্দীর প্রথমদিকে রচিত তাঁহার ভূগোল গ্রন্থে লিখিয়াছেন যে সাগর হইতে গঙ্গার মোহনায় প্রবেশ করার পর বিদেশীয় বাণিজ্য-সম্ভার গঙ্গা বক্ষ দিয়া পাটলিপুত্রে নীত হয়। মেগাস্থিনিসের বিবরণেও তাম্রলিপ্তের সহিত পাটলিপুত্রের জলপথে যোগাযোগের উল্লেখ আছে। জাতকের কাহিনী হইতেও দেখা যায় যে বণিকেরা চম্পা হইয়া জলপথে তাম্রলিপ্তে আসিত। অতঃপর তাহারা সরাসরি অথবা সিংহল ঘুরিয়া সুবর্ণ দ্বীপে যাইত (৩)।

খ্রীষ্টীয় একাদশ শতাব্দীতে (১০৬৩-৮১) সোমদেব রচিত কথাসরিৎসাগর গ্রন্থে বাংলার পুণ্ড্র বর্দ্ধন নগর, পৌণ্ড্র দেশ, এবং বর্দ্ধমান ও তাম্রলিপ্তের নাম বহুবার উল্লিখিত হইয়াছে। এই নগরীগুলিকে বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নগরী, সমৃদ্ধ ও সজ্জন ব্যক্তিগণের আবাসস্থান ইত্যাদি বলা হইয়াছে।

এই রূপ কয়েকটি কাহিনীর উল্লেখ করা যাইতেছে।

বিদূষক নামে এক ব্রাহ্মণ উজ্জয়িনী হইতে পুণ্ড্র বর্দ্ধন আসেন। এই স্থান হইতে তিনি তাম্রলিপ্ত আগমন করেন (১৮ অধ্যায়)। এক ব্রাহ্মণ বারাণসী হইতে পুণ্ড্র বর্দ্ধন আসেন (১৪ অঃ)। দীর্ঘদর্শিন নামে এক ব্যক্তি অঙ্গ দেশ হইতে পৌণ্ড্র দেশে আসেন ও এই দেশের একটি সমুদ্র তীরবর্তী স্থান (তাম্রলিপ্ত ?) হইতে জলপথে সুবর্ণ দ্বীপ গমন করেন (৮৬ অঃ)। তাম্রলিপ্ত-বাসী বণিক্ ধনদত্ত পুত্র গুহসেন সহ দূর দেশে বাণিজ্য করিতে যান ও তথা হইতে ধর্মগুপ্ত নামে এক বণিকের কন্যাকে অপহরণ করিয়া তাম্রলিপ্তে লইয়া আসেন। এই কন্যার সহিত পরে গুহসেনের বিবাহ হয়। পরে গুহসেন জলপথে কটাহ দেশে (Cathay, মালয় উপদ্বীপ ?) বাণিজ্য যাত্রা করেন (১৩শ অধ্যায়)। মদ্র দেশের শাকল (পাঞ্জাবের শিয়াল কোট) হইতে তথাকার রাজপুত্র তাম্রলিপ্তের রাজা বীরভটের দুই কন্যাকে অপহরণ করিয়া লইয়া যান। ক্রুদ্ধ বীরভট

(১) McCrindle-Ancient India as described by Ptolemy.
(২) M.R. Kale—Dasakumara Charita
(৩) Jatakas, IV. pp 15—17, V. p 34

এই বিষয়ে প্রতিকার প্রার্থনা করিয়া শাকলরাজের নিকট দূত প্রেরণ করেন। বিনিময়ে শাকলরাজও তাম্রলিপ্তে দূত প্রেরণ করেন। পরে রাজ-কন্যাদের সহিত শাকল রাজপুত্রের বিধি সম্মত বিবাহ দানের জন্য শাকলরাজ, রাজপুত্র ও অপহৃতা রাজকন্যা দুইটিকে সঙ্গে লইয়া তাম্রলিপ্তে আসেন। পরে পুত্র-পুত্রবধূদ্বয় ও লোকজন সহ স্বদেশে ফিরিয়া যান (৪৪ অ:)। দাক্ষিণাত্য হইতে এক ক্ষত্রিয় যোদ্ধা তাম্রলিপ্তে আসিয়া রাজা চন্দ্রশীলের অধীনে কর্ম গ্রহণ করেন (৮১অ:)। তাম্রলিপ্তবাসী এক বণিক্-পুত্র বিশালার (বৈশালী) এক শ্রেষ্ঠীর কন্যাকে বিবাহ করিয়া দীর্ঘকাল সেই স্থানেই থাকিয়া যান, পরে পিতামাতাকে দর্শন মানসে তাম্রলিপ্তে ফিরিয়া আসেন (৯৫অ:)। বর্দ্ধমান শহরে পরোপকারিন নামে এক রাজা বাস করিতেন। তাঁহার কন্যার পণ এই ছিল, যে ব্যক্তি স্বর্ণ নগরী দেখিয়াছে তাহাকেই সে পতিত্বে বরণ করিবে। রাজকন্যাকে লাভ করিবার লোভে শক্তি বেগ নামক এক ব্রাহ্মণ বিন্ধ্যারণ্যে যান, সেই স্থান হইতে তিনি কাম্পিল্যে যান। এখান হইতে তিনি সমুদ্র-তীরে আসেন এবং এক বণিকের সঙ্গে সমুদ্র যাত্রা করেন (২৫শ ও ২৬শ অ:)।

বর্দ্ধমান হইতে এক চিত্রকর কলিঙ্গ দেশে গিয়া সেখানকার রাজকন্যার একটি সুন্দর প্রতিমূর্তি নির্মাণ করেন (১২৩ অ:)। পাটলিপুত্রবাসী এক ব্রাহ্মণ বর্দ্ধমানে আসিয়া সেখানকার এক তরুণীর পাণি গ্রহণ করেন, তাহার পর বধূকে পাটলিপুত্র লইয়া যান (১২৪ অ:) (১)। গুণাঢ্যের বৃহৎ কথা অবলম্বনে ক্ষেমেন্দ্র রচিত বৃহৎ কথা-মঞ্জরী (২) গ্রন্থে বিদূষক নামে এক ব্রাহ্মণের অবন্তী হইতে পুণ্ড্রবর্দ্ধন আগমন বর্ণিত হইয়াছে (৩য় লম্বক)। এই পুস্তকটিও খ্রীঃ ১১শ শতাব্দীতে রচিত।

কথাসরিৎসাগর অথবা বৃহৎ কথা-মঞ্জরী আদৌ ঐতিহাসিক গ্রন্থ নহে। ইহাদের রচনাকাল অপেক্ষাকৃত আধুনিক। তবে স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে কথাসরিৎসাগর ও বৃহৎ কথা-মঞ্জরীর কাহিনীগুলি অন্যূন পঞ্চম খ্রীস্টাব্দে গুণাঢ্য-রচিত অধুনা-লুপ্ত 'বৃহৎ-কথা' হইতে সংগৃহীত হইয়াছে। এই কাহিনীগুলি আরও প্রাচীনকালেরও হইতে পারে। এই কাহিনীগুলিতে যে সামাজিক বা ভৌগোলিক পরিবেশ পাওয়া যায় তাহা গুণাঢ্যের সমসাময়িক কালের হওয়াই

(১) The Katha Sarit Sagara (Ocean of stories) Tr. by C. H. Tawney (10 Vols.)—1915-8.

(২) বৃহৎ কথা-মঞ্জরী—ক্ষেমেন্দ্র (কাব্যমালা ৬৯), বোম্বাই, ১৮৯১।

সম্ভব। কথাসরিৎসাগরে তাম্রলিপ্ত, বর্দ্ধমান, পৌণ্ড্রবর্দ্ধন প্রভৃতির যে উল্লেখ আছে তাহাতে বুঝা যায় যে গুণাঢ্যের কাল হইতে সোমদেবের কাল পর্যন্ত বাংলার বাহিরে বাংলার সমৃদ্ধ স্থানগুলি সুপরিচিত ছিল। ভারতের বিভিন্ন স্থানের সহিত বাংলার এই সমৃদ্ধ স্থানগুলিতে যাতায়াতের জন্য সুগম পথ সমূহও বিদ্যমান ছিল।

একাদশ শতাব্দীতে রচিত ঐতিহাসিক কাব্য রাজ-তরঙ্গিনী হইতে জানা যায় যে খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতাব্দী বা তৎপূর্ব হইতে কাশ্মীরের সহিত বাংলার যোগাযোগ স্থাপিত হইয়াছিল। গৌড়-মণ্ডলের জনৈক অধিপতি কাশ্মীররাজ-কর্তৃক আহুত হইয়া তথায় গমন করিলে তাঁহাকে হত্যা করা হয়। কয়েকজন গৌড়বাসী এই ঘটনার পর প্রতিশোধ গ্রহণ করিতে কাশ্মীর গমন করেন এবং নিজেরাও নিহত হন।

কাশ্মীর রাজপুত্র জয়পীডের (ললিতাদিত্যের পৌত্র) পুণ্ড্রবর্দ্ধন আগমন ও গৌড়রাজ কন্যার পাণি গ্রহণের একটি কাহিনীও রাজতরঙ্গিনীতে বর্ণিত হইয়াছে (১)।

প্রাচীন কালে আমাদের এই বাংলা গৌড়, বঙ্গ, বরেন্দ্র, রাঢ়, পৌণ্ড্র বা পুণ্ড্র, সুহ্ম, সমতট, হরিকেল, চন্দ্রদ্বীপ প্রভৃতি বিবিধ নামে অভিহিত হইত। অনেক সময় এই রাজ্যগুলি সমগ্র বাংলার আংশিক বিভাগমাত্রও ছিল। এই সব বিভাগের সীমা রেখা কখনই একরূপ থাকে নাই। কখনও ইহা সঙ্কুচিত কখনও বা ইহা বিস্তৃত হইয়াছে (২)।

প্রাচীন বাংলার ইতিহাস আলোচনা কালে অবিভক্ত ভারতের বঙ্গ ভাষাভাষী অঞ্চলই বুঝিতে হইবে। সাধারণ ভাবে বলিতে গেলে বলিতে হয় যে বর্তমান পশ্চিম-বঙ্গ, বাংলা-দেশ, ত্রিপুরা রাজ্য এবং আসাম ও বিহার রাজ্যের বঙ্গভাষা-ভাষী অঞ্চল লইয়া প্রাচীন বাংলা গঠিত ছিল।

প্রাচীন বাংলায় যে উন্নত ধরনের সভ্যতা ছিল আধুনিক কালে উৎখননের ফলে তাহার অভ্রান্ত-প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। ১৯৬২-৬৫ খ্রীষ্টাব্দে পশ্চিম-বাংলার বীরভূমের বোলপুর শহরের নিকট অজয় নদের উপত্যকায় 'পাণ্ডুরাজার ঢিপি' নামক স্থানটি খনন দ্বারা একটি সুপরিকল্পিত নগরীর ধ্বংসাবশেষ

(১) M.A. Stein (Eng. Tr.)—Kalhana's Raj Tarangini (chap, V) pp. 144, 148, 259, 324, 328.

(২) R. C. Majumdar—History of Ancient Bengal, pp. 1, 12.

আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই ধ্বংসাবশেষের মধ্যে প্রশস্ত রাজপথ, দুর্গাকৃতি সৌধ ও সাধারণ বাসগৃহের নিদর্শন মিলিয়াছে। এখানকার অধিবাসিগণ যে কৃষি-কার্য ও ব্যবসায়-বাণিজ্য দ্বারা সমৃদ্ধ জীবনযাত্রায় অভ্যস্ত ছিল তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। উৎখনিত মৃৎভাণ্ডাংশ, চিত্রিত মৃত্তিকা-ফলক (সীল) প্রভৃতি নিদর্শন হইতে এই স্থানের অধিবাসিগণের সহিত ভূমধ্যসাগরীয় ক্রীট, মিশর প্রভৃতি দেশের জলপথে যোগাযোগের বিষয়টি প্রমাণিত হয়। পাণ্ডু রাজার ঢিপি সন্নিহিত কুনুর, কোপাই ও বক্রেশ্বর নদীর উপত্যকা, এবং দক্ষিণ-বাংলার হরিনারায়ণপুর, চন্দ্রকেতুগড় প্রভৃতি স্থানগুলিতে তাম্রাশ্মীয় (chalcolithic) যুগের অর্থাৎ সিন্ধু-সভ্যতাকালীন যুগের প্রত্ন-নিদর্শন সমূহও আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই অঞ্চলের সহিত সিন্ধু সভ্যতার কোন সম্পর্ক ছিল কিনা তাহা অবশ্য নিঃসন্দেহে বলা সম্ভব নহে (১)।

সুতরাং খ্রীষ্ট-জন্মের বহু পূর্ব হইতেই শক্তিশালী বিভিন্ন রাজ্য লইয়া গঠিত বাঙ্গলাদেশে উত্তম শাসন-ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল ইহা বেশ বুঝা যায়। বাংলার রাষ্ট্রনায়কেরা যে সর্বভারতীয় রাজনীতিতে অংশ গ্রহণ করিতেন ইহারও প্রমাণ রহিয়াছে। মৌর্য-যুগে বাঙ্গলাদেশ মগধ সাম্রাজ্যের অঙ্গীভূত হয়। সমুদ্রগুপ্তের রাজত্বকালে বাঙ্গলাদেশ গুপ্তসাম্রাজ্যের অধীন হয়। সমতটের রাজা (পূর্ব-বাঙ্গলা, ত্রিপুরা ও চব্বিশ পরগনা অঞ্চল) সমুদ্রগুপ্তের করদ রাজা ছিলেন। গুপ্তরাজ কুমারগুপ্তের সময়ে পুণ্ড্রবর্দ্ধনভুক্তি গুপ্ত সাম্রাজ্যের একটি বিশিষ্ট অংশ ছিল, একজন রাজপ্রতিনিধির (Governor) উপর এই অঞ্চলের শাসনভার ন্যস্ত ছিল, ইনি শাসন ব্যাপারে অবশ্য প্রচুর স্বাধীনতা ভোগ করিতেন। পঞ্চম শতাব্দীতে গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতনের পর বাঙ্গলা দেশে অনেকগুলি স্বাধীন রাজ্য স্থাপিত হয়। ইহাদের মধ্যে গৌড় ও বঙ্গরাজ্য উল্লেখযোগ্য। গৌড়—উত্তর ও পশ্চিমবঙ্গ, ও বঙ্গরাজ্য দক্ষিণ ও পূর্ব বাঙ্গলা লইয়া গঠিত ছিল। রাজ্য দুইটির সীমানা বিভিন্ন সময়ের রাজাদের

(১) দ্রঃ "Archæological discoveries during the sixties have furnished evidence of a comparatively much higher degree of civilization in certain parts of Bengal even at such a remote period of first millennium B. C., perhaps even earlier, and in any case long before the Aryan settlements of the Aryans which was hitherto regarded as the beginning of higher culture and civilization in Bengal"—R. C. Majumdar, History of Ancient Bengal, p. 22 ; and

P. C. Dasgupta, (Ed.)—Exploring Bengal's Past, Calcutta, 1966.

শক্তি সামর্থ্য অনুযায়ী বিস্তৃত বা সঙ্কুচিত হইত। গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতনের পর স্বাধীন গুপ্তরাজগণ বাঙ্গলায় কিছুকাল রাজত্ব করেন। মগধের গুপ্ত-রাজগণের সহিত ইহাদের রক্ত-সম্পর্ক ছিল কিনা নিঃসন্দেহে বলা কঠিন।

তিব্বতরাজ স্রং-সানের আক্রমণে বাঙ্গলার স্বাধীন গুপ্তরাজগণের রাজ্যের ভিত্তিমূল শিথিল হয়। গুপ্তরাজগণের দুর্বলতার সুযোগে খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর প্রথম পাদে অজ্ঞাতপরিচয় শশাঙ্ক গৌড়ের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন। মুর্শিদাবাদ জেলার বহরমপুর শহরের ছয় মাইল দক্ষিণ পশ্চিমে অবস্থিত কর্ণসুবর্ণ শশাঙ্কের রাজধানী ছিল (পূর্ব রেলপথের চিরুটি রেলওয়ে স্টেশনের নিকট, মুর্শিদাবাদ জেলা)। সমগ্র উত্তর-পশ্চিমবঙ্গ (সম্ভবতঃ পূর্ববঙ্গ সহ), মগধ ও দক্ষিণে উড়িষ্যার কোঙ্গোদ (চিল্কা হ্রদের তীরবর্তী ভূভাগ) অঞ্চল এবং পশ্চিমে বারাণসী পর্যন্ত ভূখণ্ডে শশাঙ্কের রাজত্ব বিস্তৃত ছিল। কনৌজের মৌখরিরাজ্যের পূর্বাঞ্চলে প্রভুত্ব রোধ শশাঙ্কের জীবনের প্রধান লক্ষ্য ছিল। মালবের রাজা দেবগুপ্ত তাঁহার মিত্র ছিলেন। দেবগুপ্ত কনৌজ আক্রমণ করিয়া তথাকার রাজা গ্রহবর্মাকে নিহত করেন। গ্রহবর্মার শ্যালক স্থানীশ্বরাধিপতি রাজ্যবর্ধন কনৌজ রক্ষার্থে অগ্রসর হইয়া দেবগুপ্তকে নিহত করেন কিন্তু নিজে শশাঙ্কের হস্তে নিহত হন। রাজ্যবর্ধনের পর তদীয় অনুজ হর্ষবর্ধন কনৌজের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন। হর্ষবর্ধন ও তন্মিত্র কামরূপ-রাজ ভাস্করবর্মার সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়া আজীবন শশাঙ্ক নিজের সাম্রাজ্য অক্ষুণ্ণ রাখেন। শশাঙ্কের মৃত্যুর পর হর্ষবর্ধন ও ভাস্কর বর্মা কর্ণসুবর্ণ অধিকার করেন। শশাঙ্কের মৃত্যুর কিছুকাল পর চৈনিক পরিব্রাজক হিউএন্ সাঙ্ বাঙ্গলায় আগমন করিয়াছিলেন।

শশাঙ্কের মৃত্যুর পর বাঙ্গলাদেশের রাজনৈতিক শৃঙ্খলা ও সংহতি বিনষ্ট হয়। অষ্টম শতাব্দীর মধ্যভাগে বাঙ্গলার জনগণ গোপাল নামক এক ব্যক্তিকে রাজপদে নির্বাচিত করে। গোপালের পুত্র ধর্মপাল বাহুবলে উত্তর ভারতের সমগ্র গাঙ্গেয় উপত্যকায় নিজের অধিকার প্রতিষ্ঠিত করেন। কনৌজ অধিকার করিয়া তিনি নিজের আশ্রিত চক্রায়ুধ নামক এক ব্যক্তিকে কনৌজের সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করেন। পাঞ্জাব, রাজপুতানা, মালব, বেরার ও নেপালের রাজারা ধর্মপালের আনুগত্য স্বীকার করিতে বাধ্য হন। ধর্মপালের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র দেবপাল (৮১০-৮৫০ খৃঃ) আসাম ও

উড়িষ্যা জয় করেন। হুন, গুর্জর, কম্বোজ ও দ্রাবিড়দেরও তিনি যুদ্ধে পরাজিত করেন। গুর্জর প্রতিহার বংশীয় প্রবল প্রতাপান্বিত মিহির ভোজ ও দক্ষিণাপথের রাষ্ট্রকূটরাজ অমোঘবর্ষকেও দেবপালের নিকট পরাজয় বরণ করিতে হইয়াছিল। প্রায় সমগ্র আর্যাবর্ত তাঁহাকে অধীশ্বর বলিয়া স্বীকার করিত (১)।

দেবপালের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র নারায়ণ পালের (৮৫৭-৯১১ খৃঃ অব্দ) সময়ে পাল-সাম্রাজ্যের পতন আরম্ভ হয়। এই সময়ে পূর্ব ও দক্ষিণ বঙ্গে কয়েকটি স্বাধীন রাজ্যের উদ্ভব হয়। দশম শতাব্দীর শেষ ভাগে প্রথম মহীপাল পূর্ববর্তী পাল-রাজাদের গৌরব বহুলাংশে পুনরুদ্ধার করেন। তাঁহার রাজ্য পুনরায় বারাণসী পর্যন্ত বিস্তৃত হয়। প্রথম মহীপালের পর এই বংশের দ্বিতীয় মহীপাল ও রামপাল সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। রামপালের মৃত্যুর পর পাল-সাম্রাজ্যের পতন হয়। প্রায় চারিশত বৎসর ব্যাপী পাল রাজত্ব-কাল বাঙ্গলার ইতিহাসের এক মহাগৌরবময় যুগ। এই যুগে সুসংহত সামরিক-প্রতিভার সাহায্যে বাঙ্গালী জাতি উত্তর-ভারতে স্বীয় প্রভুত্ব বিস্তার করিতে সমর্থ হইয়াছিল।

অষ্টম শতাব্দীতে তিব্বতের রাজা বাঙ্গালী-বৌদ্ধপণ্ডিত নালন্দা মহাবিহারের অধ্যক্ষ শান্তি রক্ষিত বা শান্ত রক্ষিতকে দুইবার নিমন্ত্রণ করিয়া তিব্বতে লইয়া যান। ইনি তিব্বতে গিয়া বৌদ্ধ ধর্মের সংস্কার সাধন করেন। তাঁহার ভগ্নীপতি পদ্মসম্ভব এই কার্যে তাঁহার সহযোগী ছিলেন। দশম শতাব্দীতে আর একজন বাঙ্গালী বৌদ্ধ-পণ্ডিত দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান বা অতীশ বৌদ্ধধর্ম সংস্কারের জন্য নেপালের মধ্য দিয়া তিব্বতে যান। পালবংশের পর সেন রাজগণ বাঙ্গলায় রাজত্ব করেন। ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে সেন রাজগণের সময় বাঙ্গলা-দেশ মুসলমানদের দ্বারা অধিকৃত হয়।

বাঙ্গলা দেশ সুপ্রাচীন কাল হইতেই ব্যবসায়-বাণিজ্যের দ্বারা সমৃদ্ধিশালী ছিল। বাঙ্গলার বিভিন্ন স্থানে প্রাপ্ত লেখমালায় পট্টপতি, সৌলকিক ও তারিক পদাধিকারীর উল্লেখ আছে। ইহারা যথাক্রমে বাজার, শুল্ক আদায় ও নৌকা পারাপারের জন্য রাজগণ কর্তৃক নিযুক্ত হইত। গুপ্তরাজ বুদ্ধগুপ্তের এবং অন্য কয়েকটি গুপ্তকালীন তাম্রশাসনে (৫ম শতাব্দী) একটি বিশিষ্ট বাণিজ্য কেন্দ্র হিসাবে কোটিবর্ষ নগরীর নাম উল্লিখিত হইয়াছে। ফরিদপুর

(১) R. C. Majumdar (Ed.), History of Bengal, Vol. I, Ch. VI, p. 121

জেলায় (বর্তমান বাংলা দেশ) প্রাপ্ত ষষ্ঠশতাব্দীর একাধিক তাম্রশাসনে নব্যাবকাশিকানগর একটি বন্দর-শহর রূপে উল্লিখিত হইয়াছে (১)। ১১৬৫ শকাব্দে উৎকীর্ণ চট্টগ্রামে প্রাপ্ত একটি তাম্রশাসনে এই অঞ্চলের একটি রাজপথের উল্লেখ আছে (২)। বাণিজ্য-কেন্দ্ররূপে তাম্রলিপ্তের খ্যাতি ছিল বহু বিস্তৃত। তাম্রলিপ্ত হইতে জলপথ ছিল তিনটি (ক) তাম্রলিপ্ত হইতে দক্ষিণ পশ্চিম অভিমুখে আরাকান উপকূল হইয়া ব্রহ্মদেশ এবং আরও পূর্বে জাভা সুমাত্রা প্রভৃতি অঞ্চল পর্যন্ত (খ) তাম্রলিপ্ত হইতে সরাসরি দ্বীপময় ভারতের দেশগুলি অর্থাৎ জাভা সুমাত্রার দিকে (গ) দক্ষিণ-পশ্চিম মুখে কলিঙ্গ ও করমণ্ডল উপকূল হইয়া সিংহল অবধি। বাংলা হইতে সমুদ্রপথে বাণিজ্য যাত্রার উল্লেখ খ্রীষ্টীয় ১ম-২য় শতাব্দীতে লিখিত গ্রন্থ 'মিলিন্দ-পন্হো'তেও পাওয়া যায়।

পশ্চিমবঙ্গের মেদিনীপুর জেলায় অবস্থিত আধুনিক তমলুক শহরটি তাম্রলিপ্তের স্মৃতি বহন করিতেছে। সরস্বতী বা হুগলী (গঙ্গা) নদীর একটি ধারা এই শহরের পার্শ্ব দিয়া অতীতে প্রবাহিত ছিল। এই নদীর মোহানায় বঙ্গোপসাগর অবস্থিত ছিল। বর্তমান কালে কলিকাতা বন্দর হইতে যে ভাবে বঙ্গোপসাগরে উপস্থিত হওয়া যায় তাম্রলিপ্ত হইতে অর্ণব-পোতগুলি সেইভাবে বঙ্গোপসাগরে উপস্থিত হইত। বর্তমানে রূপনারায়ণ নদের দক্ষিণ তীরে তমলুক শহর অবস্থিত। সরস্বতী নদী বর্তমানে শুষ্ক, হুগলী বা গঙ্গা এই স্থান হইতে গতি পরিবর্তন করিয়া প্রায় বার মাইল দূরে সরিয়া গিয়াছে। হিউএন্ সাঙের লিখিত বিবরণেও দেখা যায় যে তাম্রলিপ্ত একটি খাঁড়ির উপর অবস্থিত ছিল। সম্ভবতঃ খ্রীষ্টীয় ৭ম-৮ম শতাব্দীতে গঙ্গার গতি-পরিবর্তনের ফলেই তাম্রলিপ্ত শ্রীভ্রষ্ট হইয়াছিল।

চৈনিক পরিব্রাজক ঈৎ-সিঙ্, ৬৭৩ খ্রীষ্টাব্দে জলপথে তাম্রলিপ্ত আগমন করেন। তাঁহার লিখিত বিবরণ হইতে জানা যায় যে তিনি তাম্রলিপ্ত হইতে পশ্চিমগামী একটি পথ ধরিয়া বুদ্ধ গয়ায় আগমন করেন। তাঁহার সহিত শত শত বণিক্ ঐ পথে ভ্রমণ করিয়াছিল (৩)। ইহা হইতে মনে হয় তাম্রলিপ্ত-বুদ্ধগয়া বা পাটলিপুত্রগামী পথটি বহু ব্যবহৃত ছিল। হাজারিবাগ জেলার

---

(১) Epigraphica Indica, XV, pp. 130, 133, 135, 138, 142; and D.C. Sarkar—Select Inscriptions, pp. 370, 366, 367.

(২) N. G. Mazumdar—Inscriptions of Bengal, Vol. III, p. 158.

(৩) Takakusu—A Record of the Buddhist Religion as practised in India and Malay Archipelago, p. xxxi.

দুধপানি পাহাড়ে প্রাপ্ত উদয়মান নামক ব্যক্তি লিখিত একটি শিলালেখ হইতে জানা যায় যে অযোধ্যা প্রভৃতি স্থান হইতে পশ্চিমাঞ্চলের বহু বণিক্ নিয়মিত ভাবে তাম্রলিপ্ত যাতায়াত করিত (১)।

এই বিবরণীগুলি হইতে অনুমান করা যাইতে পারে যে ৭-৮ম শতাব্দীতে তাম্রলিপ্ত হইতে একটি পথ কর্ণসুবর্ণ-কজঙ্গল (রাজমহল)-চম্পা-ভাগলপুর হইয়া পাটলিপুত্র পৌছিত। আর একটি পথ সরাসরি উত্তরমুখে গয়া পর্যন্ত গিয়া পশ্চিমে বাঁকিয়া অযোধ্যা পৌছিত।

পুণ্ড্র-বৰ্দ্ধন হইতে কামরূপ পথটি অতি প্রাচীন পথ। কামরূপ বা আসামের উৎপন্ন দ্রব্য এই পথে পুণ্ড্রবৰ্দ্ধন হইয়া উত্তর ভারতে নীত হইত। চৈনিক পরিব্রাজক হিউএন্-সাঙ্ এই পথ ধরিয়া কামরূপ পৌছান। এই পথটি আসাম-মণিপুর ও উত্তর ব্রহ্মের মধ্য দিয়া দক্ষিণ চীন পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। এই পথের প্রান্ত ভারতের সীমানা ছাড়াইয়া ব্যাকৃট্রিয়া (বাল্খ) পর্যন্ত যে বিস্তৃত ছিল তাহার প্রমাণ আছে। য়ু-চি রাজ্যে চীনা রাজদূত চাঙ্-কিয়েন (Chang Kein) খ্রীঃ পূঃ ২৭৮ অব্দে ব্যাকৃট্রিয়া রাজ্যে চীনের য়ুনান ও সজোয়ান প্রদেশের (Sze Chuan) বাঁশ ও রেশম দেখিয়া অত্যন্ত বিস্মিত হন। তিনি অনুসন্ধান দ্বারা জানিতে পারেন যে ভারতবর্ষের মধ্য দিয়া দক্ষিণ চীন হইতে এই সব দ্রব্যাদি শকট বাহিত (Caravan) হইয়া গান্ধার দেশে আমদানী হইত। হিউএন্-সাঙ্ যখন কামরূপ আসেন তখন তিনি এই প্রাচীন পথটির অস্তিত্ব জানিতে পারেন (২)। এই আসাম-ব্রহ্ম-চীন পথটি পাটলিপুত্র, চম্পা (ভাগলপুরের নিকট), কজঙ্গল (রাজমহল), হইতে বর্তমান মালদহ জেলার মধ্য দিয়া পুণ্ড্রবৰ্দ্ধন পৌছিত (বর্তমান বাংলাদেশের মহাস্থান)। পুণ্ড্রবৰ্দ্ধন হইতে কামরূপ পৌছিয়া এই পথটি পাতকোই পর্বত মালার গিরি পথের মধ্য দিয়া ব্রহ্মদেশের উত্তর অঞ্চলে অবস্থিত ভামো পৌছিত। এখানে এই পথটির সহিত আরও দুইটি পথ আসিয়া মিলিত। এই দুইটি পথের একটি ছিল মণিপুর অঞ্চল ও চিন্দুইন নদীর উপত্যকা হইতে ও অপরটি ছিল আরাকানের মধ্য দিয়া ইরাবতী নদীর উপত্যকা হইতে। অতঃপর এই সংযুক্ত পথটি পর্বতমালা ও বিভিন্ন নদীর উপত্যকা ধরিয়া চীনের য়ুনান ফু (কানসিং) পৌছিত (৩)। চৈনিক পরিব্রাজক কিয়া তানের (Kia Tan,

(১) Epigraphica Indica—Vol. ii, p. 345.
(২) S. Beal—Budhist Records of the Western World, p. 185.
(৩) P. C. Bagchi—India and China, p. 5, 16, 18 ff.

৮ম শতাব্দী) বিবরণে দক্ষিণ চীনের বাণিজ্য কেন্দ্র টঙ্কিন হইতে ভারতে আগমনের জন্য এইরূপ একটি পথের উল্লেখ আছে। এই পথটি চীনের চৌকু লিয়াং হইতে ভামো ও চিন্দুইন হইয়া কামরূপ পৌছিত (১)।

আসাম হইতে বহির্ভারত মুখী আরও কয়েকটি পথের সন্ধান পাওয়া যায়। আসামের খণ্ড জাতি সমূহের পূর্ব পুরুষেরা খ্রীষ্ট জন্মের প্রায় তিন হাজার বৎসর পূর্বে (c. 2750 BC) দক্ষিণ চীনের শাঙ্‌ পো নদীর গতিপথ ধরিয়া আসামের পূর্বোত্তর অঞ্চলের মধ্য দিয়া ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় বাস স্থাপন করে। চীনের শিংফু হইতে লাঙ্কাউ, সিনিংফু ও ককনুরা হইয়া দক্ষিণ-পশ্চিম মুখে লাসা, চাম্বী উপত্যকা হইয়া সিকিমের মধ্য দিয়া গাঙ্গেয় উপত্যকার দিকেও একটি পথ প্রাচীন কালে ছিল। অপর একটি পথ ছিল তিব্বতের লাসা হইতে আসামের নিম্ন ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার দিকে। মানস-সরোবর হইতে সুবর্ণসিরি নদীর গতিপথ ধরিয়া একটি পথও আসামে পৌছিত। আসামের দরং জেলা হইতে ধানসিরি নদীর গতিপথ ধরিয়া ভুটান ও তিব্বত পর্যন্ত একটি বাণিজ্য-পথ এখনও প্রচলিত আছে। এই পথ দিয়া মধ্য এসিয়া, চীন ও তিব্বত হইতে বণিকেরা আসামে আসিত। ইহারা প্রধানত: রেশম বিক্রয় করিত। এই জন্য ইহারা Ceres, Ceredoi ও অবশেষে 'কিরাত' আখ্যায় অভিহিত হইত। আসামে রেশম চাষ ইহারাই প্রবর্তন করে। আসামে উপনিবিষ্ট হইয়া রেশম উৎপাদন ব্যতীত কৃষি-কর্মেও ইহারা আত্মনিয়োগ করিয়াছিল। আসামের অষ্ট্রিক জাতীয় আদিম অধিবাসীদের পরাজিত করিয়া ইহাদের বংশধরেরা আসামের স্থায়ী অধিবাসী হইয়া যায় (২)।

উত্তর বঙ্গের জলপাইগুড়ি দার্জিলিং অঞ্চল হইতে সিকিম ও চাম্বী উপত্যকা ধরিয়া হিমালয়ের গিরিসঙ্কটের মধ্য দিয়া যে পথটি তিব্বত ও চীন অভিমুখে বিস্তৃত ছিল সেই পথে রেশম প্রভৃতি পণ্য গঙ্গা বাহিত হইয়া তাম্রলিপ্তের মধ্য দিয়া Damricia (তামিল রাজ্য)-তে নীত হওয়ার উল্লেখ পেরিপ্লাসের বিবরণেও পাওয়া যায় (৩)। পূর্বোক্ত গিরিপথই ছিল তিব্বত হইতে বৌদ্ধযাত্রীদের ভারতে যাতায়াতের পথ।

---

(১) R. C. Majumdar—Champa, p. VIII ff.; Bulletin de l' Ecole Francaise d' Extreme Orient—Vol. IV (1904), 131 ff, 142-43.

(২) R.M. Nath—The Back ground of Assamese culture, pp. 3, 14.

(৩) The Periplus of the Erythrean Sea, pp. 47, 255.

স্থলপথে বাঙ্গলা হইতে কলিঙ্গ উপকূল ধরিয়া পথটি দক্ষিণভারত পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। এই পথ হিউএন্ সাঙ্ এবং দক্ষিণ জয়াভিলাষী বাঙ্গলার পাল ও সেনরাজগণ কর্তৃক ব্যবহৃত হইয়াছিল। চালুক্য, চোল ও পূর্ব গঙ্গ বংশীয় রাজারা এই পথে আসিয়া বাঙ্গলা আক্রমণ করেন। পরবর্তী কালে শ্রীচৈতন্য দক্ষিণ-ভ্রমণ কালে অল্পবিস্তর এই পথটিই ব্যবহার করেন।

পূর্ব বাঙ্গলার ত্রিপুরা অঞ্চল হইতে (পাটিকেরা রাজ্য) সুরমা ও কাছাড় উপত্যকার মধ্য দিয়া লুসাই পাহাড়, মণিপুর ভেদ করিয়া একটি পথ মধ্যব্রহ্মের পাগান পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। চটগ্রাম হইতে আরাকান হইয়া অন্য একটি পথ নিম্ন ব্রহ্মের প্রোম পর্যন্ত প্রসারিত ছিল (১)।

হিউএন্-সাঙের বিবরণে লিখিত আছে যে তাম্রলিপ্ত হইতে সমতট এবং সমতট হইতে সমুদ্রের তীরবর্তী পথ ধরিয়া দক্ষিণ-পূর্বদিকে ব্রহ্মের রাজধানী শ্রীক্ষেত্রে পৌছান যায় (শ্রীক্ষেত্র ব্রহ্ম দেশের রাজধানী প্রোমের প্রাচীন নাম)। আরও দক্ষিণ মুখে গমন করিলে কমলঙ্ক (পেগু) অবস্থিত। কমলঙ্ক হইতে দ্বারাপতি (Sandoway) পৌছিয়া সেই স্থান হইতে শ্যাম দেশ (থাইল্যাণ্ড) যাওয়া সম্ভব (২)।

কামরূপ হইতে হিউএন্-সাঙের সমতট আগমন পথটির অস্তিত্ব খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। বাংলার নিত্যপরিবর্তনশীল নদীমালার গতিপ্রবাহ এই পথটিকে সম্ভবতঃ নিশ্চিহ্ন করিয়া দিয়াছে।

ভারতীয় পুরাতত্ত্ব বিভাগের প্রতিবেদনের অষ্টম খণ্ডে তাম্রলিপ্ত-পাটলিপুত্র পথটির একটি আনুমানিক রূপ দেওয়া হইয়াছে। প্রতিবেদনের লেখকের (J. D. Beglar) মতে পুরাতত্ত্বের দিক হইতে উল্লেখযোগ্য কোন পথের সন্ধান করিতে হইলে ঐ অঞ্চলের অন্যান্য পুরাতত্ত্ব সমৃদ্ধ স্থানগুলির মধ্য দিয়াই উহা খুঁজিয়া বাহির করা কর্তব্য। এই পথ-রেখা নির্ভুল হওয়ার সম্ভাবনা অধিক। প্রতিবেদন লেখকের এই সিদ্ধান্ত সমীচীন বলিয়া বোধ হয়, কারণ সভ্যতা নদী অথবা রাজপথের উভয় দিকে বিকশিত হওয়ার সম্ভাবনা অধিকতর।

বেগ্‌লার-এর মতে তাম্রলিপ্ত-পাটলিপুত্র পথটি বর্তমান বাঁকুড়া জেলার বিষ্ণুপুর, বহুলাড়া (বাঁকুড়া শহর হইতে বার মাইল), একটেশ্বর, ছাতনা, রঘুনাথপুর, তেলকুপি হইয়া দামোদর নদ অতিক্রম করিয়া ঝরিয়া, রাজগীর

---

(১) নীহাররঞ্জন রায়—বাঙ্গালীর ইতিহাস, ৩য় অধ্যায়।

(২) S. Beal—Life of Hiuen Tsang, p. 133.

হইয়া পাটলিপুত্র পৌছিত। বেগ্‌লার অনুমান করিয়াছেন যে তাম্রলিপ্ত-পাটলিপুত্র পথটি আধুনিক বাঁকুড়া জেলা পর্যন্ত অগ্রসর হইয়া ভিন্ন ভিন্ন অঞ্চলের মধ্য দিয়া পাটলিপুত্রে পুনর্মিলিত হইত। এইরূপ একটি পথ আধুনিক বাঁকুড়া জেলা, বীরভূমের সিউড়ি শহর, দেওঘর, মন্দার পাহাড়, ভাগলপুর, আফ্‌সান্দ, ও পার্বতীর মধ্য দিয়া পাটলিপুত্রে যাইত।

বাঁকুড়া জেলার ছাতনা হইতে পঞ্চকোট পাহাড়ের পার্শ্ব দিয়া বরাকর নদী অতিক্রম করিয়া নোয়াদা হইয়া একটি পথ রাজগীর যাইত। বাঁকুড়া জেলার একটেশ্বর হইতে একটি শাখা পথ দ্বারকেশ্বর নদী অতিক্রম করিত। অতঃপর পথটি রাণীগঞ্জ অঞ্চল ধরিয়া ভীমগড়ের নিকট অজয় নদী পার হইত। অজয়ের অপর তীর হইতে বীরভূমের বক্রেশ্বর-রাজনগর অঞ্চল, মন্দার পাহাড় হইয়া পথটি মুঙ্গেরে আসিয়া ক্ষান্ত হইত।

বারাণসী—তাম্রলিপ্ত পথটির গতিপথ পূর্বোক্ত প্রতিবেদনে এইরূপ অনুমিত হইয়াছে—তাম্রলিপ্ত (আধুনিক মেদিনীপুরের তমলুক), কাঁসাই নদীতীরস্থ বুধপুর, বড়বাজার, অতঃপর সুবর্ণরেখা পার হইয়া রাঁচী-পালামৌ হইয়া বারাণসী। পাটলিপুত্র-তাম্রলিপ্ত ও তাম্রলিপ্ত-বারাণসী এই দুইটি পথ পাকবিড়া-বুধপুর (পুরুলিয়ার নিকট) অঞ্চলে আসিয়া মিলিত হইত (১)। বর্তমানে বাংলায় যে পথগুলি প্রচলিত আছে তাহা অনেক ক্ষেত্রেই প্রাচীন কালের পথের সংস্কৃত রূপ। আবার বহু প্রাচীন পথ হয়ত মৃত্তিকা গর্ভে বিলীন হইয়া গিয়াছে। ১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দে উত্তর বঙ্গে ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ দেখা দিলে বঙ্গীয় সরকার দুর্ভিক্ষ নিবারণের উদ্দেশ্যে রাস্তা প্রস্তুতের জন্য দুর্ভিক্ষ কবলিত লোকদের এই কার্যে নিযুক্ত করিতেন। এইরূপ কাজ করাইবার সময় দিনাজপুর জেলার দেবকোট নামক স্থানে ছয়টি প্রাচীন পথ মাটি খুঁড়িতে খুঁড়িতে আবিষ্কৃত হয় (২)। দেবকোট হইতে একটি পথ পূর্ব দিকে ঘোড়াঘাট অভিমুখে, একটি পথ দেবকোট হইতে পশ্চিমে তাজপুর অভিমুখে ও আর একটি পথ দক্ষিণে মালদহ অভিমুখে ছিল, অপর তিনটি পথ কোথায় শেষ হইয়াছিল তাহা জানা যায় নাই। কর্ণসুবর্ণ-কজঙ্গল (রাজমহল)-পুণ্ড্রবর্দ্ধন-গামী সুপ্রাচীন পথটি নিঃসন্দেহে মালদহ জেলার (গৌড় অঞ্চল) মধ্য

(১) J. D Beglar—Report of Archæological Survey of India, Vol. VII, p. 140; Vol, VIII, p. 48-51.

(২) দ্রষ্টব্য——Indian Antiquary, April 1874. pp. 123-24

দিয়া ছিল. দেবকোটের দক্ষিণে গৌড়গামী পথটি সম্ভবতঃ ছিল এই প্রাচীন দীর্ঘ পথের খণ্ডাংশ। দেবকোট হইতে ঘোড়াঘাটের দিকে ধাবিত পথটি সম্ভবতঃ রঙ্গপুর জেলার মধ্য দিয়া পুণ্ড্রবর্দ্ধন-কামরূপগামী পথটির খণ্ডাংশ। স্থানীয় লোকেরা মাটির নীচে পাওয়া পথগুলিকে বাদশাহী সড়কের ধ্বংসাবশেষ বলিয়া মনে করিত। এই পথগুলির ধারে ধারে প্রস্তর নির্মিত সাঁকো, ভগ্ন বাঁধ, প্রভৃতি ধ্বংসাবশেষ-মধ্যে প্রাপ্ত হিন্দুদেবদেবীর মূর্তি হইতে অনুমান করিতে পারা যায় যে পথগুলি হিন্দু-রাজত্বকালেই নির্মিত হইয়াছিল। মুসলমান শাসন-কালে গৌড়ের স্বাধীন সুলতানেরা সম্ভবতঃ পথগুলি সংস্কার করেন। ইহারা নিজেদের প্রয়োজনে কিছু নূতন পথও প্রস্তুত করাইয়াছিলেন। লোকমুখে এই প্রাচীন পথগুলি সাধারণ ভাবে বাদশাহী সড়ক নামে পরিচিত। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে শতবর্ষ পূর্বে দেবকোটে পথ প্রস্তুতের সময় কাহারও জানা ছিল না যে এই দেবকোটের মৃত্তিকাভ্যন্তরে প্রাচীন বাংলার সুপ্রসিদ্ধ কোটিবর্ষ নগরী লুক্কায়িত ছিল। খ্রীষ্টীয় ত্রয়োদশ শতকে মুসলমান শাসনকাল হইতে এই স্থানটি দেবকোট বা দেবীকোট নামে অভিহিত হইয়া আসিতেছে। বর্তমান শতাব্দীর চতুর্থ দশকে এই স্থানটি উৎখননের ফলে বিরাট ধ্বংসস্তূপের মধ্য হইতে বাস্তুগৃহ, দেব-দেউল, প্রাসাদ, দুর্গ-প্রাকার, প্রাচীন মুদ্রা, লেখমালা, প্রস্তর ও মৃন্ময় মূর্তি প্রভৃতি পাওয়া যায়। মৌর্য-শুঙ্গ হইতে পালযুগ পর্যন্ত যে এই স্থানটি সমৃদ্ধ ছিল প্রাপ্ত পুরাবস্তু হইতে তাহা প্রমাণিত হইয়াছে। এই স্থানের একাংশ বাণগড় নামে পরিচিত ছিল। পুরাণোক্ত বলি রাজার পুত্র বাণের ইহা রাজধানী ছিল বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে। পশ্চিমবঙ্গের দিনাজপুর জেলার গঙ্গারামপুর থানার এক মাইল দূরত্বের মধ্যে এই কোটিবর্ষ নগরীর ধংসাবশেষ অবস্থিত।

প্রাচীন বাংলার বড় বড় নগরী গুলির চারি পার্শ্বে ক্ষুদ্র বৃহৎ বহু গ্রাম ছিল। নগরের পথগুলির সহিত এই গ্রাম্য পথগুলির সংযোগ ছিল। গ্রাম ও নগর-গুলির অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক যোগাযোগের জন্য এই সংযোগ ছিল অপরিহার্য।

বাংলায় প্রাপ্ত শিলালিপি ও তাম্রশাসনে বহু গ্রামের নাম আছে। এইরূপ কয়েকটি গ্রামের নাম বল্লাহিট্‌ঠা (বালুটিয়া), বিড্ডার_শাসন (উত্তর রাঢ়, বর্দ্ধমান ভুক্তি), সিদ্ধলগ্রাম (উত্তর রাঢ়, বীরভূম জেলা), বপাঘোষ বাট্ (উত্তর রাঢ়), বৃহৎ ছত্তিবন্না-খাণ্ডয়িল্লা (খাড়ুলিয়া), অম্বয়িল্লা (অম্বল গ্রাম), জেলা সোথী, ভূরিশ্রেষ্ঠী

মোলা ডাণ্ডী (মুরুণ্ডি), প্রভৃতি। শেষোক্ত গ্রামগুলি দক্ষিণ রাঢ় অর্থাৎ হাওড়া-হুগলী জেলা অঞ্চলে অবস্থিত ছিল।

কণ্ডেড়দক, ক্রৌঞ্চশ্বভ্র, রামসিদ্ধি পাঠক, বিনয় তিলক, তালপাড়া পাটক, ধামহিথা, মাথরণ্ডিয়া, শান্তিগোপী, মালামঞ্চ বাটী প্রভৃতি গ্রামগুলি দক্ষিণ বাংলায় নাব্য অঞ্চলে অবস্থিত ছিল। পূর্ব বাংলায় অবস্থিত গ্রামগুলির নাম বেলহিষ্ঠী (বিক্রমপুর অঞ্চল), ফল্গু গ্রাম, ধার্যগ্রাম, পিঙ্গোকাষ্ঠী (পিঙ্গরি, ফরিদপুর জেলা), কন্দর্প সঙ্কর (ফরিদপুর জেলা) দেওলহস্তি (বিক্রমপুর অঞ্চল), ভট্টপাটক (ভাটেরা, কুমিল্লার নিকট)। নিম্নলিখিত গ্রামগুলি উত্তর বাংলায় (রাজশাহী—দিনাজপুর-বগুড়া অঞ্চলে) অবস্থিত ছিল :—পলাশ বৃন্দক, চণ্ডগ্রাম, স্বচ্ছন্দ পাটক, সাতুবনাশ্রমক, ডোঙ্গাগ্রাম, ব্যয়িগ্রাম (বৈগ্রাম, বগুড়া), পুরাণ বৃন্দিক হরি, পৃষ্টিম পোট্টক, গোষাট পুঞ্জক, নিত্ব গোহালী, পলাশাট্ট, বট গোহালী, কুরট পল্লিকা, ব্রাহ্মণীগ্রাম, দাপনিয়া পাটক, বালগ্রাম প্রভৃতি।

প্রাচীন বাংলার সমৃদ্ধ নগরীগুলির মধ্যে নিম্নলিখিত নামগুলি উল্লেখ-যোগ্য :—

তাম্রলিপ্ত (মেদিনীপুর জেলার তমলুক', সিংহপুর (সিংহলী গ্রন্থে উল্লিখিত লাট্-পতি সিংহবাহুর রাজধানী, সম্ভবতঃ হুগলী জেলার বর্তমান সিঙ্গুর), বর্দ্ধমান, অতীতে ইহা দামোদর তীরে অবস্থিত ছিল। পুষ্কর্ণা (দামোদর নদের দক্ষিণ তীরে বাঁকুড়া জেলায় অবস্থিত, বর্তমান নাম পোখর্ণা), খৃষ্টীয় চতুর্থ শতকে এই স্থানটি প্রসিদ্ধ ছিল। প্রিয়ঙ্গু (দণ্ডভুক্তির কম্বোজ রাজাদের রাজধানী, সম্ভবতঃ হুগলী বা মেদিনীপুর জেলায় কোন অজ্ঞাত স্থানে অবস্থিত ছিল)। মহারাজ লক্ষণ সেনের সভাকবি ধোয়ী রচিত পবন-দূত কাব্যে সেনরাজধানী রূপে বিজয়পুরের উল্লেখ আছে, সম্ভবতঃ এই স্থানটি বর্তমান ত্রিবেণীর নিকট অবস্থিত ছিল। হুগলী জেলায় ত্রিবেণী (ব্যাণ্ডেল স্টেশনের নিকট গঙ্গা-যমুনা ও সরস্বতী এই তিনটি নদীর সঙ্গম স্থলে অবস্থিত) একটি প্রসিদ্ধ স্থান ছিল, ইহাকে মুক্তবেণী বলা হইত। সরস্বতী ও যমুনা নদী বর্তমানে শুষ্ক হইয়া যাওয়াতে নগর হিসাবে ইহার গুরুত্ব হ্রাস পাইয়াছে, তবে তীর্থক্ষেত্র হিসাবে ইহার প্রসিদ্ধি বর্তমান আছে।

সেনরাজগণের দ্বিতীয় রাজধানী নবদ্বীপ (নদীয়া জেলায়) এখনও বর্তমান। শ্রীচৈতন্যের জন্মস্থান ও সংস্কৃত চর্চা কেন্দ্ররূপে এখনও ইহার মহিমা অক্ষুণ্ণ আছে।

প্রাচীন রামাবতী নগরীর অস্তিত্ব সঠিক নির্ণয় করা যায় না। পালসম্রাট রামপাল গৌড়ের অদূরে গঙ্গা ও করতোয়া নদীর সঙ্গমস্থলে এই নূতন রাজধানী

স্থাপন করেন। এই নগরের সন্নিকটে জগদ্দল নামে একটি সুবিখ্যাত বিহার ছিল। পশ্চিম বাংলার মালদহ জেলার বামনগাঁও থানার চার মাইল দক্ষিণ পূর্ব কোণে জগদ্দলা নামক স্থানটিতেই সম্ভবতঃ জগদ্দল বিহার অবস্থিত ছিল। দণ্ডভুক্তি নগর (মেদিনীপুর জেলার দাঁতন); চম্পানগরী (অঙ্গরাজ্যের রাজধানী চম্পা ব্যতীত বাংলায়ও একটি চম্পানগরী ছিল, সম্ভবতঃ দক্ষিণ বাংলার কোন স্থানে ইহা অবস্থিত ছিল)। পূর্ব রেলপথের ব্যাণ্ডেল-বারহারোয়া শাখার চিরুটি স্টেশনের নিকট কর্ণসুবর্ণ সন্নিহিত রক্তমৃত্তিকা বিহার আবিষ্কৃত হইয়াছে, সুতরাং কর্ণসুবর্ণের অবস্থিতিও এই অঞ্চলেই ছিল অনুমান করা যাইতে পারে। এই স্থানটি মুর্শিদাবাদ জেলার বহরমপুর শহরের নিকটে অবস্থিত। উদুম্বর—বীরভূম জেলার পশ্চিমাঞ্চল অথবা মুর্শিদাবাদ জেলার পূর্বাঞ্চলে এই স্থানটি অবস্থিত ছিল। বাংলার ইতিহাস বিখ্যাত গৌড় নগরীর ধ্বংসাবশেষ মালদহ জেলায় প্রায় ১৬ বর্গ মাইল ব্যাপিয়া অবস্থিত। সেন সম্রাট লক্ষ্মণ সেন গৌড় নগরীর পার্শ্বেই স্বনামে লক্ষ্মণাবতী নামে একটি নগর স্থাপন করেন; এইটিই হয় তাঁহার রাজধানী। বাংলার মুসলমান শাসনকালের প্রথম যুগে এই স্থান গৌড়-লখ্‌নৌতি নামে পরিচিত ছিল। লক্ষ্মণাবতীর ধ্বংসাবশেষও গৌড়ের ধ্বংসাবশেষের মধ্যেই পাওয়া যায়। পরবর্তী কালে গৌড়-লখ্‌নৌতি হইতে বাংলার রাজধানী পাণ্ডুয়ায় স্থানান্তরিত হইয়াছিল। পুণ্ড্র বর্দ্ধন বা পুণ্ড্র নগর বর্তমান বাংলাদেশের বগুড়া জেলার বগুড়া শহর হইতে ৮ মাইল উত্তরে করতোয়া নদীর পশ্চিম তটে অবস্থিত মহাস্থান নামে পরিচিত। এই স্থানটিতে উৎখননের দ্বারা বহু প্রত্নবস্তু আবিষ্কৃত হইয়াছে। প্রাচীন পুণ্ড্রনগরী ভুক্তির পঞ্চনগরী নামক প্রসিদ্ধ স্থানটিও সম্ভবতঃ দিনাজপুর জেলায় অবস্থিত ছিল। বাংলা দেশের রাজশাহী জেলায় অবস্থিত পাহাড়পুর প্রাচীন কালে একটি সমৃদ্ধ জনপদ ছিল। খ্রীঃ পঞ্চম শতকে ইহার একাংশ বটগোহালি নামে পরিচিত ছিল। পালযুগে এই স্থানটিতে সোমপুর বিহার নামে একটি সুবৃহৎ বৌদ্ধবিহার প্রতিষ্ঠিত ছিল। খৃষ্টীয় একাদশ শতকে আক্রমণকারীদের দ্বারা এই স্থানটি সম্পূর্ণভাবে বিনষ্ট হয়।

পূর্ব বাংলায় রামপাল নামে সমৃদ্ধ নগরীর বিস্তৃত ধ্বংসাবশেষ ঢাকা জেলার মুন্সীগঞ্জ শহরের অদূরে পাইকপাড়া গ্রামের নিকট অবস্থিত। এই অঞ্চলের বজ্রযোগিনী নামক পল্লীতে অতীশ দীপঙ্করের জন্ম হয়।

পূর্ব বাংলায় শ্রীবিক্রমপুর একটি প্রাচীন নগর। এই স্থানটি ঢাকা জেলার মুন্সীগঞ্জ মহকুমার ও ফরিদপুর জেলার কতকাংশ লইয়া গঠিত ছিল। এই স্থানটি বাংলার বহু বরেণ্য সন্তানের জন্মভূমি।

নব্যাবকাশিকা পূর্ব বাংলায় একটি প্রসিদ্ধ বাণিজ্যকেন্দ্র ছিল। সম্ভবতঃ ইহা বর্তমান ঢাকা জেলার নদীবহুল সাভার অঞ্চলে অবস্থিত ছিল। বর্তমান চট্টগ্রাম শহর প্রাচীন কালে চাটিগ্রাম রূপে প্রসিদ্ধ ছিল। প্রাচীন বাংলার সুপ্রসিদ্ধ পট্টিকেরা নগরটি সম্ভবতঃ বর্তমান ত্রিপুরার ময়নামতী নামক স্থানে অবস্থিত ছিল। এই স্থানটি খননের ফলে একটি প্রাচীন নগরীর ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হইয়াছে। পূর্ব বাংলার অপর একটি প্রসিদ্ধ নগর ছিল জয়কর্মান্ত বাসক। সম্ভবতঃ এই স্থানটি ত্রিপুরা জেলায় বর্তমানে বড় কামতা নামক স্থানে অবস্থিত ছিল (১)।

(১) দ্রষ্টব্য—N. G. Majumdar—Inscriptions of Bengal;
R. C. Majumdar—History of Bengal, Vol. I pp. 29-34;
Benoy Chandra Sen—Some Historical Aspects of the Inscriptions of Bengal (Chap III);
এবং নীহাররঞ্জন রায়—বাঙ্গালীর ইতিহাস (৮ম অধ্যায়)।

পথ-পরিচয়—মধ্য যুগ ও আধুনিক যুগ

প্রাচীন ভারতের ইতিহাসের সীমাকাল ঐতিহাসিকদের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী দশম শতাব্দী পর্যন্ত বিস্তৃত। একাদশ শতাব্দী হইতে ভারতেতিহাসের মধ্যযুগ।

প্রাচীন ভারতেতিহাসের শেষ অধ্যায় পর্যন্ত ভারতবর্ষের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত এবং প্রতি প্রান্তে যে পথাবলী মানবদেহের শিরা উপশিরার ন্যায় দেশময় সুবিন্যস্ত হইয়া গিয়াছিল তাহার পরিচয় দেওয়া হইয়াছে। মুসলমান শাসনকালে মুসলমান সম্রাটদের এবং স্বাধীন বা অর্দ্ধ স্বাধীন হিন্দু রাজাদের চেষ্টায় মধ্যযুগে আরও বহু নূতন নূতন পথের সৃষ্টি হয়। বাঙ্গলা দেশে মুসলমান রাজাদের নির্মিত বহু পথ আছে, পল্লীবাসীদের নিকট এইগুলি "বাদশাহী সড়ক" বলিয়া পরিচিত।

মুসলমান নৃপতিদের মধ্যে শের শাহ্ বহু পথের নির্মাতা বলিয়া প্রসিদ্ধ। কলিকাতা হইতে পেশোয়ার পর্যন্ত বর্তমানে 'Grand Trunk Road' নামে পরিচিত পথটি তাঁহারই দ্বারা নির্মিত বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে। এই ধারণাটি অবশ্য ভুল। Grand Trunk Road নামে প্রসিদ্ধ পথটিই পাণিনি বর্ণিত উত্তরাপথ, এই পথেই খ্রীষ্টজন্মের প্রায় তিনশত বৎসর পূর্বে গ্রীক্ রাজদূত ও ঐতিহাসিক মেগাস্থিনিস ভারতে প্রবেশ করিয়া পাটলিপুত্র আগমন করেন। তিনি এই পথটিকে Royal Road বা রাজকীয় পথ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। শেরশাহ এই পথটি স্থানে স্থানে তাঁহার প্রয়োজনানুযায়ী সংস্কৃত ও পরিবর্তিত করেন। বিহার অঞ্চল হইতে ঢাকা জেলার সোনার গাঁ পর্যন্ত এই পথটি বিস্তৃত করা অবশ্য তাঁহারই কীর্তি। বাংলাদেশের পূর্ব প্রান্তের সোনার গাঁ হইতে সিন্ধু উপত্যকা পর্যন্ত পথটি তিনি 'কঙ্কর' দ্বারা বাঁধাইয়াছিলেন। প্রাচীন মৌর্য নরপতিগণের আদর্শে তিনি এই দীর্ঘ পথের দুই ধারে ফলবান ছায়াতরু রোপণ করান। পথিমধ্যে পান্থগণেরও বিশ্রামের ব্যবস্থা ছিল (১)। "তারিখ-ই-শেরশাহী" গ্রন্থে এই পথটি "সড়ক-ই-আজম" নামে অভিহিত হইয়াছে। শেরশাহ্ স্বয়ং নিম্নলিখিত পথগুলিও নির্মাণ করাইয়াছিলেন (১) আগ্রা হইতে

(১) Kalika Ranjan Quanungo—Sher Shah, Calcutta, 1921, p. 388

দক্ষিণগামী বুরহানপুর পথ (২) আগ্রা হইতে যোধপুর চিতোর পথ (৩) লাহোর হইতে মুলতান গামী পথ প্রভৃতি।

শেরশাহের স্বল্পকাল পূর্ববর্তী প্রথম মুঘল সম্রাট বাবরও একজন উৎসাহী পথ নির্মাতা ছিলেন। বাবর ও শেরশাহের পর সম্রাট্ আকবর অনেকগুলি নূতন পথ নির্মাণ করান। ইহার মধ্যে শতপুরা পর্বতমালার মধ্য দিয়া দাক্ষিণাত্যগামী একটি পথের কথা বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। মারাঠাদের সহিত দীর্ঘকালীন যুদ্ধ চালাইতে গিয়া সম্রাট্ আওরঙ্গজেবকেও বহু পথ নির্মাণ করাইতে হইয়াছিল। মুঘল শাসনের অন্তিম পর্যায়ে অষ্টাদশ শতকের ভারতে ভারতবর্ষের প্রধান প্রধান পথগুলি নিম্নলিখিতরূপ ছিল :—

(১) বক্সার বেনারস, দিল্লী, কর্ণাল, সির্হিন্দ্, লুধিয়ানা, লাহোর, গুজরাত, রাওলপিণ্ডি, আটক, পেশোয়ার হইয়া কাবুল গামী পথ; (২) রেওয়ারী, আজমীর, শিরোহী, আহমদাবাদ, সুরাট হইয়া দিল্লীপথ; (৩) মথুরা, আগ্রা, ঢোলপুর, গোয়ালিয়র, মাড়োয়ার, সিরনোজ, হিন্দিয়া, বিদর হইয়া দিল্লী—গোলকুণ্ডা পথ; (৪) গোলকুণ্ডা, বিজাপুর পথ; (৫) আহম্মদনগর, আওরঙ্গাবাদ হইয়া বিজাপুরা উজ্জয়িনী পথ; (৬) আওরঙ্গাবাদ, গোলকুণ্ডা, কোল্লুর, বেজওয়াড়া হইয়া সুরাট, মুসলিপত্তন পথ; (৭) এলাহাবাদ, বেনারস, পাটনা, ভাগলপুর হইয়া আগ্রা, ঢাকা পথ; (৮) গুজরাত, নওসেরা হইয়া লাহোর, শ্রীনগর পথ; (৯) নওসেরা, মুলতান, লাহোর হইয়া কান্দাহার পথ; (১০) দাভোল, রাজপুর হইয়া সুরাট, গোয়া পথ; (১১) শ্রীনগর, আটক পথ (১২) আটক, কান্দাহার পথ (১)।

বর্তমানে আমাদের ভারতবর্ষে যে পথগুলি রহিয়াছে সেগুলি প্রধানতঃ ইংরাজ শাসনকালের বহু পূর্ব হইতেই বিদ্যমান ছিল। ইংরাজ শাসনের প্রথম দিকে পথের উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয় নাই। বর্তমান শতকের প্রথম দিকে শুদ্ধমাত্র রেলপথ একটি প্রগতিশীল দেশের পক্ষে পর্যাপ্ত মনে না হওয়ায় দেশবাসীর পক্ষ হইতে পথাবলীর প্রতি অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করার দাবী উঠিতে থাকে। এই দাবী পূরণের জন্য ১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দে তদানীন্তন রাষ্ট্রীয় পরিষদ্ (Council of State) কর্তৃক প্রসিদ্ধ ব্যবহারজীবী ও রাজনীতিজ্ঞ শ্রীমুকুন্দরাম জয়াকরের নেতৃত্বে একটি কমিটি (Committee) গঠিত হয়।

---

(১) Jadunath Sarkar—The India of Aurangjeb, 1902 (Chap. V).

এই কমিটি স্থির করেন যে জাতীয় প্রয়োজনে পথগুলির রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব ভারত সরকারের গ্রহণ করা উচিত। অতঃপর দেশস্থ পথগুলির রক্ষণাবেক্ষণাদির উদ্দেশ্যে ১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দে একটি তহবিল প্রতিষ্ঠিত হয় ও কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদের সদস্যদের লইয়া গঠিত একটি স্থায়ী কমিটির উপর এই তহবিলের পরিচালনভার ন্যস্ত হয়। এই তহবিলের সাহায্যে ১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত ভারতবর্ষে ১২৩০ মাইল পথ 'কংক্রিট' প্রভৃতি দ্বারা বাঁধানো হয় ও ১৫০০ মাইল নূতন পথ নির্মিত হয়। শেষোক্ত এই ১৫০০ মাইল নূতন পথ বৎসরের সকল সময়ে ব্যবহার যোগ্য ছিল না বলিয়া উহা 'fair weather road' নামে আখ্যাত। ইহা ব্যতীত ২২০০ শত মাইল পুরাতন পথও বাঁধানো (Metalled) হয়। ১৯৩৪ খ্রীষ্টাব্দে পথের উন্নতি বিধানের জন্য ভারতীয় পথ সংস্থা বা 'Indian Roads Congress' নামে আধা সরকারী প্রতিষ্ঠানটি গঠিত হয়। অতঃপর গত দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের প্রয়োজনে প্রতিরক্ষা ব্যয়ের খাতে অনেকগুলি নূতন পথ নির্মিত হইয়া যায়। ১৯৪৩ খ্রীষ্টাব্দে ভারতীয় পথ সংস্থা বা Indian Roads Congress-এর নাগপুর অধিবেশনে পথ সম্বন্ধে একটি পরিকল্পনা গৃহীত হয়। এই গুরুত্বপূর্ণ পরিকল্পনা 'Nagpur Plan' নামে পরিচিত। এই পরিকল্পনায় পথগুলিকে গুরুত্ব ও প্রকৃতি অনুযায়ী নিম্নলিখিত ভাবে শ্রেণীবদ্ধ করা হইয়াছে :—

(১) জাতীয় সড়ক (National Highways)—বিভিন্ন প্রদেশ, বন্দর ও বিদেশগামী দেশের পথের সহিত সংযুক্ত বিধায় এই পথ সর্বাধিকগুরুত্বপূর্ণ; (২) প্রাদেশিক সড়ক (State Highways); (৩) মুখ্য শ্রেণীর জেলা-পথ (Major District Roads); (৪) গৌণ শ্রেণীর জেলাপথ ও গ্রামপথ (Minor District Roads and Village Roads)। পথগুলির সুসম শ্রীবৃদ্ধির উদ্দেশ্যে এই পরিকল্পনা যুদ্ধোত্তর কুড়ি বৎসরকালের জন্য গৃহীত হইয়াছিল।

ভারত সরকার ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাস হইতে এই পরিকল্পনার বিভিন্ন প্রস্তাব কার্যকরী করিতে আরম্ভ করেন। ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ই আগষ্ট ভারতের স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর এই বিষয়ে জাতীয় সরকার বিশেষ মনোযোগ প্রদর্শন করিতে থাকেন। ১৯৫৬ খ্রীষ্টাব্দে ভারত-সরকার "ইণ্ডিয়ান হাইওয়েজ্ এ্যাক্ট" নামে একটি আইন প্রণয়ন করেন। সর্ব ভারতে কতকগুলি জাতীয় সড়ক নির্মাণ ও তাহাদের রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব গ্রহণই ছিল এই আইনের উদ্দেশ্য।

প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাকালান্তে আমাদের দেশে ৩০৯,৬৫৬ মাইল পথ ছিল। ইহার মধ্যে ছিল ১১৩, ৭২৫ মাইল 'পাকা' (Metalled) পথ এবং ১৯৫,৯৩১ মাইল কাঁচা পথ। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা অন্তে পাকা ও কাঁচা পথের দৈর্ঘ্য ছিল যথাক্রমে ১,৪৬,৫১৩ ও ২,৯৪,১১৩ অর্থাৎ মোট ৪,৪০,৬২৬ মাইল।

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় পরিকল্পনার মাইলের লক্ষ্য হিসাবে ছাড়াইয়া গেলেও পথগুলি আদর্শানুযায়ী নির্মিত হয় নাই। তজ্জন্য তৎকালে জাতীয় সংসদ (পার্লামেণ্ট) কর্তৃক নিযুক্ত 'এস্টিমেটস্ কমিটি' (Estimates Committee) ভারত সরকারকে ১৯৮১ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত দেশের প্রয়োজনের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া দেশের পথগুলির উন্নতি বিধানের জন্য পরামর্শ দান করেন। এই পরামর্শ অনুযায়ী তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার প্রথম বৎসর (১৯৬১) হইতে ১৯৮১ খ্রীষ্টাব্দ অর্থাৎ মোট কুড়ি বৎসরের জন্য পথগুলির উন্নতি বিধায়ক একটি সুস্পষ্ট কর্মধারার নীতি ভারত সরকার কর্তৃক গৃহীত হইয়াছে। এই পরিকল্পনা অনুসারে ১৯৮১ খ্রীঃ নাগাদ ভারতে ৬,৫৭,০০০ মাইল (১০,৫১২০০ কিঃ মিঃ) পথ থাকিবে (১)। এই পরিকল্পনা অনুসারে কত মাইল কি ধরনের পথ থাকিবে তাহার বিবরণ দেওয়া হইতেছে :—

বৃহৎ পথ (Main Roads) :

আন্তঃরাজ্য সড়ক	৩২,০০০ মাইল	
রাজ্যবর্তী "	৭০,০০০ "	
জেলাবর্তী "	১,৫০,০০০ "	
		২,৫২,০০০ মাইল

অন্যান্য :

জেলাবর্তী মুখ্য সড়ক	১,৮০,০০০ "	
বিভিন্ন ধরনের গ্রাম্য "	২,২৫,০০০ "	
		৪,০৫,০০০ মাইল
	মোট—	৬,৫৭,০০০ মাইল

স্বাধীনতা লাভের প্রাক্‌কালে ভারতে মোট পথের দৈর্ঘ্য ছিল ৩,৮৮,২২৬ কিঃ মিঃ (২৪,২৬৪১ মাইল)। ১৯৭১-৭২ খ্রীঃ এই পথের দৈর্ঘ্য ১১৩,০০০০ কিঃ মিঃ দাঁড়াইয়াছে। প্রথম তিনটি পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় (যোজনা) পথ-নির্মাণ ও সংরক্ষণের জন্য ৮৩১·৩৯ কোটি টাকা ব্যয় করা হয়। চতুর্থ যোজনাকালে

(১) History of road development in India, New Delhi, 1963.

এইজন্য ৮২২'৩৭ কোটি টাকা ধার্য হয়, ইহার মধ্যে ৩২৮ কোটি টাকা আন্তঃরাজ্য বা জাতীয় সড়ক নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য নির্দিষ্ট রাখা হয়। পঞ্চম-পরিকল্পনায়—পথখাতে ১,৭৭৪ কোটি ব্যয়িত হইবে।

বর্তমানে আমাদের দেশের জাতীয় সড়করূপে বর্ণিত আন্তঃরাজ্য পথাবলীর দৈর্ঘ্য ২৮,৮১৯ কিঃ মিঃ।

এই পথগুলি সরকার কর্তৃক একটি নির্দিষ্ট সংখ্যা দ্বারা চিহ্নিত হইয়াছে। এই পথের ক্রমিক সংখ্যা, সরকার চিহ্নিত সংখ্যা ও পথের বিবরণ দৈর্ঘ্য সহ নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

জাতীয় সড়ক

ক্রমিক সংখ্যা	পথের চিহ্ন সংখ্যা	পথের বিবরণ	দৈর্ঘ্য (কিঃ মিঃ)
১	১	দিল্লী—আম্বালা—জলন্ধর—অমৃতসর হইয়া—পাকিস্তান সীমান্ত	৪৬৯.২০
২	১ (ক)	জলন্ধর—শ্রীনগর—বরমুলা—উরি	৬৫২.৭৪
৩	২	দিল্লী—মথুরা—আগ্রা—কানপুর—এলাহাবাদ বারাণসী—বার্‌হি—কলিকাতা	১৩৮৭.০০
৪	৩	আগ্রা—গোয়ালিয়র—শিবপুরী—ইন্দোর—নাসিক—থানা—বোম্বাই	১১২২.০৯
৫	৪	থানা—পুনা—বেলগাঁও—হুবলী—বাঙ্গালোর—রাণীপেট—মাদ্রাজ	১২০৭.২০
৬	৫	বহারাগোরা—কটক—ভুবনেশ্বর—বিশাখাপত্তনম্—বিজয়ওয়াড়া—মাদ্রাজ	১৪৫৭.৬২
৭	৬	ধুলিয়া—নাগপুর—রায়পুর—সম্বলপুর—বহারাগোরা—কলিকাতা	১৫৭৮.৩২
৮	৭	বারাণসী—মাঙ্গওয়ান—রেওয়া—জব্বলপুর—নাগপুর—হায়দ্রাবাদ—কুরনুল—বাঙ্গালোর—কৃষ্ণগিরি—সালেম—ডিণ্ডিগুল—মাদুরাই—কন্যাকুমারী	২৩২৪'৬৩

ক্রমিক সংখ্যা	পথের চিহ্ন সংখ্যা	পথের বিবরণ	দৈর্ঘ্য (কিঃ মিঃ)
৯	৮	দিল্লী—জয়পুর—আজমীর—উদয়পুর—আমেদাবাদ, বরোদা—বোম্বাই	১৩৬৫.২৯
১০	৮ (ক)	আমেদাবাদ—লিম্বডি—মর্ভি—কাণ্ডলা	৩৯৯.৪২
১১	৮ (খ)	বামনবোর—রাজকোট—পোরবন্দর	২০১.৩৬
১২	৯	পুনা—শোলাপুর—হায়দ্রাবাদ—বিজয়ওয়াড়া	৭৭৮.৫০
১৩	১০	দিল্লী—ফাজিলকা হইয়া পাকিস্তান সীমান্ত	৩৮২.৪১
১৪	১১	আগ্রা—ভরতপুর—জয়পুর—বিকানীর	৫৪৭.৩৬
১৫	১২	জব্বলপুর—ভূপাল—বিয়াওরা	৪০০.৪১
১৬	১৩	শোলাপুব—চিত্রদুর্গ	৪১৯·৪২
১৭	২২	আম্বালা—কালকা—সিমলা—নারকাণ্ডা—রামপুর—চিনি—সিপ্‌কি-লা (তিব্বত সীমান্ত)	৪৪৬.৫৮
১৮	২৪	দিল্লী—বেরিলী—লক্ষ্ণৌ	৪৩৯·৩৪
১৯	২৫	লক্ষ্ণৌ—কানপুর—ঝাঁসী—শিবপুরী	৩০৬·৩৭
২০	২৬	ঝাঁসী—লাখ্‌নাদন্‌	৩৮৬·৪২
২১	২৭	এলাহাবাদ—মাঙ্গাওয়ান্‌	৯৪·৫৪
২২	২৮	বারৌনি—মজঃফরপুর—পিপরা—গোরক্ষপুর—লক্ষ্ণৌ	৬০০.০০
২৩	২৮ (ক)	পিপ্‌রা—সাগৌলি—রক্সৌল হইতে নেপাল সীমান্ত	৬৭.১৮
২৪	২৯	গোরক্ষপুর—গাজীপুর—বারাণসী	২০৩.০০
২৫	৩০	মোহানিয়া—পাটনা—বক্তিয়ারপুর	২০৮.৪০
২৬	৩১	বার্হি—বক্তিয়ারপুর—মোকামা—পূর্ণিয়া—ডালখোলা, —শিলিগুড়ি—সিভোক—কুচবিহার—নর্থসালমারা, —নলবারি—চারালি—আমিনগাঁও	১১৬৯·৭৫
২৭	৩১ (ক)	সিভোক—গ্যাংটক	৯৪.১৪
২৮	৩১ (খ)	নর্থসালমারা—গোয়ালপারা	১৯.৩১
২৯	৩২	গোবিন্দপুর—ধানবাদ—পুরুলিয়া—জামসেদপুর	১৯৫.০০
৩০	৩৩	বার্হি—রাঁচি—টাটানগর—বাহারাগোরা	৩১৮.৬৫
৩১	৩৪	ডালখোলা—বহরমপুর—বারাসাত—কলিকাতা	৪১৯.৬২
৩২	৩৫	বারাসাত—বনগাঁও হইতে পূর্ববাংলা সীমান্ত (বাংলাদেশ)	৪৮.০৭

ক্রমিক সংখ্যা	পথের চিহ্ন সংখ্যা	পথের বিবরণ	দৈর্ঘ্য (কিঃ মিঃ)
৩৩	৩৭	গোয়ালপারা—গৌহাটি—জোড়হাট—কামারগাঁও—মাকুম—সাইখোয়া ঘাট	৬৬৬.৪৫
৩৪	৩৮	মাকুম—লেডো—লেখাপানি	৫৪.১০
৩৫	৩৯	কামারগাঁও—ইম্ফল—পালেল হইতে ব্রহ্ম সীমান্ত	৪২৪.৮৬
৩৬	৪০	জোড়হাট—শিলং—ডাউকি-বাংলাদেশ সীমান্ত	১৬১.৩৩
৩৭	৪১	কোলাঘাট—হলদিয়া	৫২.০৯
২৮	৪২	সম্বলপুর—আঙ্গুল—কটক	২৫৩.৬৬
৩৯	৪৩	রায়পুর—ভিজিয়ানাগ্রাম	৫৫৩.৮০
৪০	৪৫	মাদ্রাজ—তিরুচিরাপল্লী—ডিণ্ডিগুল	৪০৭.৭৮
৪১	৪৬	কৃষ্ণগিরি—রাণীপেত	১৪৩.৬৩
৪২	৪৭	সালেম—কোয়েম্বাটুর—ত্রিচুর—এর্নাকুলাম—ত্রিবেন্দ্রম্—কন্যাকুমারী	৫৮৫.৩৮
৪৩	৪৭ (ক)	ত্রিচুর—চাল্লিসেরি	৩১.৪০
৪৪	৪৯	মাদুরাই—ধনুষ্কোটি	১৮১.০৪
৪৫	৫০	নাসিক—পুনা	১৯৯.১৫

ভারতের পূর্ব ও উত্তর সীমান্তের অঞ্চলগুলির অর্থনৈতিক উন্নতির জন্য ভারত-সরকার দেশের অন্যান্য স্থানের পথগুলির সহিত এই অঞ্চলের সংযোগ সাধনের জন্য ১৯৬০ খ্রীষ্টাব্দে একটি 'পরিষদ্' (বোর্ড) গঠন করেন। এই উদ্দেশ্যে ৭,৪০০ কিঃ মিঃ নূতন পথ নির্মাণ, ও ১৫,৭১০ কিঃ মিঃ দৈর্ঘ্যের পথের সংস্কার ও উন্নতিসাধন প্রয়োজন হইবে। এ যাবৎ (১) সিমলা হইতে ১৭৬ মাইল দীর্ঘ হিন্দুস্থান-তিব্বত (২) আসাম হইতে নেফায় অবস্থিত বম্‌ডিলাগামী পথ (৩) এবং পূর্ব-ভূটান অভিমুখে একটি পথ নির্মিত হইয়াছে।

জাতীয় সরকার কর্তৃক নিযুক্ত আধা-সরকারী প্রতিষ্ঠান ভারতীয় পথ-সংস্থার (**Indian Roads Congress**) কর্তব্য হইতেছে সদস্যদের নিকট হইতে পথ-নির্মাণ ও উন্নতি সম্বন্ধীয় তথ্য আহরণ, সিদ্ধান্ত-স্থিরীকরণ এবং পরামর্শদান। এতদ্ব্যতীত কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে পথ-বিষয়ক একাধিক প্রতিষ্ঠান আছে, উহাদের নাম (1) **Central Roads Organisation** ও (2) **Central Designs Office** ; প্রথমোক্ত প্রতিষ্ঠানটি ভারত সরকারের পথ-সংক্রান্ত

পূর্তবিভাগীয় পরামর্শদাতার (Consulting Engineer to the Govt. of India Roads) নিয়ন্ত্রণাধীনে পরিচালিত হয়। এই সংস্থা জাতীয় সড়কগুলির রক্ষণাবেক্ষণ ব্যতীত অন্যান্য পথগুলি সম্বন্ধে গবেষণা ও তথ্যাদি আহরণ করেন। সমস্ত দেশের পথের প্রয়োজনে যন্ত্রাদি আমদানী ও উপযুক্ত পথ-পূর্তবিদ্দের বিদেশে শিক্ষাদানের ব্যবস্থাপনার দায়িত্বও এই সংস্থার উপর ন্যস্ত। 'Central Designs Office' এই সংস্থারই অধীন। ১৯৫২ খ্রীঃ প্রতিষ্ঠিত (দিল্লী) 'Central Road Research Institute' নামক প্রতিষ্ঠানে পথ সম্বন্ধীয় নানা গবেষণা-কার্য পরিচালিত হয় এবং অঙ্গরাজ্যগুলিকে প্রয়োজনীয় তথ্যাদি ও পরামর্শ সরবরাহ করা হয়। জাতীয় সড়ক এবং বিশেষভাবে নির্বাচিত গুরুত্বপূর্ণ পথ-গুলি ব্যতীত রাজ্যের মধ্যস্থ পথগুলি নির্মাণ ও সংরক্ষণের দায়িত্ব ভারতের অঙ্গরাজ্যগুলিকে বহন করিতে হয় (১)।

পাঁচ সহস্র বৎসরেরও পূর্বে সিন্ধুসভ্যতার প্রবর্তক ও ধারকেরা পথ নির্মাণে যে উৎসাহ ও দক্ষতা দেখাইয়াছিলেন সেই উৎসাহ ও দক্ষতা আজ ও নিষ্প্রভ হয় নাই। আধুনিক-বিজ্ঞানের সহায়তায় নব-ভারতের নাগরিকেরা আজ দেশের দিকে দিকে নূতন নূতন পথের প্রবাহ আনিয়া দিতেছেন, পুরাতন পথগুলিও পুনরুজ্জীবিত ও সংস্কৃত হইতেছে। নব ভারতের পথ-বিন্যাস বিশেষ ভাবে ভারতীয় রেলপথের গতিপথগুলি লক্ষ্য করিলে ইহা স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে এই সব পথ ও রেলপথ প্রাচীন ভারতের পথাবলীর ধারা অনুসরণ করিয়াই গড়িয়া উঠিয়াছে। প্রাচীন ভারতের ঐতিহ্য নবীনভারতের জয়যাত্রার আশীর্বাণী ও অমূল্য পাথেয়—ইহা আমাদের স্মরণ রাখা কর্তব্য।

(১) দ্রষ্টব্য—Our Roads (Modern India Series 11) Published by the Publications Division, Ministry of Information and Broadcasting, Govt. of India, 1948;

India—Reference annual, 1971-1976.

পরিশিষ্ট (খ)

প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যে পথ-প্রসঙ্গ

রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডে ভরত কর্তৃক অযোধ্যা হইতে শৃঙ্গবেরপুর পর্যন্ত পথ নির্মাণের বিবরণ পূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে। এই বিবরণে দেখা যায় যে ভরত কর্তৃক পথ-নির্মাণের জন্য ভূমি বিশেষজ্ঞ (Geologist), খনক, স্থপতি, বৃক্ষছেদক, পথ-প্রদর্শক প্রভৃতি নিযুক্ত হইয়াছিল। ইহা হইতে রামায়ণের যুগে পথ-নির্মাণ বিদ্যায় প্রগতির আভাস পাওয়া যায় (২। ৮০)।

মহাভারতের শান্তি পর্বে রাজধর্ম বর্ণন প্রসঙ্গে ভীষ্ম কর্তৃক যুধিষ্ঠিরকে রাজার পক্ষে রাজপথ নির্মাণের প্রয়োজনীয়তা স্মরণ করাইয়া দিতে দেখা যায়। ভীষ্ম বলিতেছেন—

"বিশালান্ রাজমার্গাশ্চ কারয়ীত নরাধিপঃ
প্রপাশ্চ বিপণাশ্চৈব যথোদ্দেশং সমাদিশেৎ"। (শান্তিপর্ব, ৬৯। ৫৩)

(রাজা বিশাল রাজপথ নির্মাণ করাইবেন এবং স্থানে স্থানে পানীয়শালা ও বিপণিসকল স্থাপনের আদেশ দিবেন।)

বণিকদের ক্রয়, বিক্রয়, যাতায়াতের সুব্যবস্থা, অন্ন ও পরিচ্ছদের অবস্থা প্রভৃতি পর্যবেক্ষণের পর তাহাদের উপর কর নির্দ্ধারণের ব্যবস্থা রাজার কর্তব্য বলা হইয়াছে। বণিকদের ব্যবসা-বাণিজ্য পরিচালনের জন্য উপযুক্ত পথাবলী নির্মাণের নির্দেশ ইহাতে প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে, "বিক্রয়ং ক্রয়মধ্বানাং ভক্তঞ্চ সপরিচ্ছদম্, যোগক্ষেমঞ্চ সম্প্রেক্ষ্য বণিজাং কারয়েৎ করান্ (শান্তি, ৮৭।১৩)।" এই প্রসঙ্গে ভীষ্ম যুধিষ্ঠিরকে আরও প্রশ্ন করেন—"যাহারা দূর দেশে যাইয়া বাণিজ্য করে তাহারা তোমার রাজ্যে করভারে পীড়িত হইয়া বাস করেনা ত?" (কচ্চিৎ বণিজো রাষ্ট্রে নোদ্বিজন্তি করার্দিতা, ক্রীণন্তো বহুনাল্পেন কান্তার কৃত বিশ্রমাঃ,—শান্তি ৮৯।২৩।) এখানে পিতামহ ভীষ্ম যুধিষ্ঠিরকে দূরদেশে যাহারা বাণিজ্য করিতে যায় তাহাদিগকে করভারে নিপীড়িত না করিবার উপদেশ দিতেছেন। এই শ্লোকটিতে মহাভারতের যুগে বাণিজ্যার্থ বণিকদের দূরদেশে গমনেরও ইতিহাস জানা যাইতেছে।

মহাভারতের অংশ বলিয়া পরিগণিত হরিবংশে দেখা যায় যে শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার নূতন রাজধানী দ্বারাবতী (দ্বারকা) নির্মাণের কালে স্থপতিদের রাজপথ সকল

(রাজমার্গাশ্চ) নির্মাণের জন্য বিশেষ নির্দেশ দিতেছেন (২।৫৮।৯)। টীকাকার নীলকণ্ঠ রাজপথের ব্যাখ্যা করিতে গিয়া লিখিয়াছেন "দ্বাভ্যাং পণ্যপঙ্‌ক্তিভ্যাং কল্পিত দীর্ঘ রথ্যারূপ।" দ্বারকাপুরী নির্মিত হইলে দেখা গেল সেখানে দীর্ঘ রাজপথ সকল শোভা পাইতেছে—(সমৃদ্ধ চত্বরবতী বেশ্মোত্তম ঘনার্চিতা, রথ্যা কোটি সহস্রাঢ্যা শুভ্ররাজপথোত্তরা, হরিবংশ, ২।৫৮।৪৮)। উত্তরকালে দ্বারাবতী নগরী সম্প্রসারিত ও পুনঃনির্মিত হয়, এই নগরীতে আটটি মহারথ্যা (যান-বাহন যোগ্য পথ) ও সাতটি মহাপথ ও অন্যান্য পথ নির্মিত হইয়াছিল দেখা যায় (হরিবংশ, ২।৯৮। ২৮-২৯)।

কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে রাজার কর্তব্য এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে—"তিনি (রাজা) আকর, কর্মান্ত (শিল্প কারখানা), দ্রব্যবন (দারু চন্দনাদি মূল্যবান বৃক্ষাদির বন). হস্তিবন, ব্রজ প্রচার ও বণিকপথ প্রচার এবং জলপথ, স্থলপথ ও পত্তন নিবেশিত করিবেন"।

(বণিকপথ প্রচারের অর্থ বিদেশ হইতে আমদানী ও স্বদেশ হইতে রপ্তানী দ্রব্য পরিবহনের উপযোগী পথ নির্মাণ।)

"তিনি রাজকর্মচারী, চোর ও পশুসংঘ দ্বারা ক্ষীয়মান বণিকপথ শোধিত রাখিবেন (অর্থাৎ দুষ্টরাজকর্মচারী, চোর এবং হস্তী-ব্যাঘ্রাদির উপদ্রব হইতে বণিকপথ মুক্ত রাখিবেন)।" (অধ্যক্ষ প্রচার, ২য় অধিকরণ, প্রথম অধ্যায়; ১৯শ প্রকরণ জনপদ নিবেশ।)

কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে দুর্গস্থাপনের নির্দেশ এইরূপ: ইহাতে (দুর্গে) চারিদণ্ড পরিমিত (৮ গজ) বিস্তারযুক্ত রথ্যা (রথবহন যোগ্য পথ) থাকিবে। রাজমার্গ, দ্রোণমুখ (চারিশত গ্রাম-যুক্ত উপনগর) যাওয়ার পথ, স্থানীয়ে (আটশত গ্রামযুক্ত মহাগ্রাম) এবং সংযানীয়ে (ক্রয়-বিক্রয়ের উপযুক্ত স্থান) যাওয়ার পথ, ব্যূহপথ (শত্রু সমাগমে সৈন্য বাহির করিয়া লওয়ার পথ) শ্মশানে যাওয়ার পথ ও গ্রামে প্রবেশের পথগুলি আট দণ্ড (১৬ গজ) বিস্তার যুক্ত হইবে। সেতুপথ ও বনপথ চারিদণ্ড পরিমিত বিস্তার যুক্ত হইবে। রথপথ পাঁচ অরত্নি (২½ গজ) ও পশুপথ (গোমহিষাদির গমনাগমন জন্য) চারি অরত্নি পরিমিত এবং মেষাদি ক্ষুদ্র পশুপথ ও মনুষ্যপথ দুই অরত্নি পরিমিত হইবে [অধ্যক্ষ—২য় অধিঃ, চতুর্থ অঃ, ২২ প্রঃ, দুর্গ নিবেশ] (১)।

---

(১) কৌটিলীয় অর্থশাস্ত্র (বঙ্গানুবাদ)—ডঃ রাধাগোবিন্দ বসাক, ১ম খণ্ড, কলিকাতা, ২য় সং, ১৯৬৪।

কোটিলীয় অর্থশাস্ত্রের নির্দেশমতে প্রতি নগরে তিনটি পূর্ব-পশ্চিম মুখী ও তিনটি উত্তর-দক্ষিণমুখী রাজ-পথ থাকিবে। প্রতিটি পথে দুইটি করিয়া প্রবেশ দ্বার থাকিবে। প্রধান পথগুলি ৩২ হস্ত পরিমিত হইবে। পথগুলির সহিত রাষ্ট্রের রাজধানীর ও অন্যান্য অংশে অবস্থিত পথের সংযোগ থাকিবে। পথের মধ্যে নদীগুলি কাষ্ঠ অথবা ইষ্টক নির্মিত সেতু অথবা নৌকাযোগে পার হওয়ার নির্দেশ আছে।

ময়মুনি রচিত 'ময়মতম্' নামক বাস্তুবিদ্যা বিষয়ক অতি প্রাচীন পুস্তকে লিখিত আছে যে নগরের পূর্ব-পশ্চিমে সরল রেখায় ১২, ১০, ৮, ৬, ৪ অথবা ২টি পথ থাকিবে। এই পথগুলির নাম মহাপথ। মহাপথগুলির মধ্যে যে পথটি নগরের কেন্দ্রস্থল দিয়া ধাবমান তাহার নাম ব্রহ্মবীথি। ব্রহ্মবীথির পার্শ্ববর্তী পথগুলির নাম রাজবীথি। রাজবীথিগুলির প্রান্তে তোরণ (Gates) থাকিবে। গ্রামের চতুষ্পার্শ্ব ঘিরিয়া যে পথ থাকিবে তাহার নাম মঙ্গল-বীথিকা। নগরের রাজধানীর চতুষ্পার্শ্ব দিয়া যে পথ তাহার নাম জনবীথিকা, ইহাকে রথ্যাও বলা হইত। পথগুলি ৪ হস্ত হইতে ২০ হস্ত পরিমাণ হইবে।

ব্রহ্মবীথি বা মহাকাল বীথিগুলি নগরকে রাষ্ট্রের ও ভিন্ন রাষ্ট্রের সহিত সংযুক্ত রাখিত। বিদেশী পথিক ও ব্যবসায় বাণিজ্যের কাজে এই পথগুলিই ব্যবহৃত হইত (১)।

---

(১) দ্রষ্টব্যঃ গ্রাম প্রসঙ্গে—

"প্রাক প্রত্যাগতা-মার্গা ঋজুদণ্ড মহাপথাখ্যাস্তে ।৩৬
মধ্যম যুক্ত বীথ্যৌ ব্রহ্মাখ্য সৈব নাতিঃ স্যাৎ
হার সমেতা বীথি রাজাখ্যা দ্বিপার্শ্বতঃ ক্ষুদ্রা ।৩৭
সর্বাকুট্টিমকাখ্যা মঙ্গল বীথি তথৈব রথামার্গম্
তির্যগ দ্বার সমেতা নারাচ পথ ইতি খ্যাতাঃ ।৩৮
উত্তর দিঙ্ মুখ মার্গা ক্ষুদ্রার্গল বামনাখ্যা পথা
গ্রামাবৃতা মঙ্গল বীথিকাখ্যা পুরাবৃতা চ জনবীথিকা স্যাৎ
তয়োস্তু রথ্যাভিহিতা স্যাৎ পুরাতনৈরন্তমেবথৈবম্ ।৩৯"

নগরপ্রসঙ্গে—

"প্রাক প্রত্যাগতামার্গা দ্ব'দশদশবাষ্টষট্ চতুর্গল,
তাবদদুদীচিনাস্তে তত্রৈবাযুগ্মসঙখ্যয়া বা
একাদশ নব সপ্তক পঞ্চগুণোবৈক মার্গা বা
যুগাযুগ্ম পদেষু দ্বেক ত্রিভি বংশকৈরজাংশাস্যুঃ।"
(ময়মতম্, ৯।৬২—৬৩)

Ed. by M. M. Ganapati Sastri, Trivandrum, 1912.

হিন্দু স্থাপত্য বিজ্ঞানের অতি বিখ্যাত গ্রন্থ "মানসার" পুস্তকে গ্রামলক্ষণ বিধান অধ্যায়ে গ্রামগুলি চারি অংশে বিভক্ত রাখিতে বলা হইয়াছে। এই চারি অংশ আবার একপ্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত ঋজুগামী পথ দ্বারা অনেকগুলি ভাগে বিভক্ত রাখিতে বলা হইয়াছে। দুইটি প্রধান পথ গ্রামের মধ্যভাগে মিলিত থাকা ও এই পথের এক পার্শ্বে পাদপথ (Foot-path) রাখার নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। আরও বলা হইয়াছে যে সমগ্র গ্রামকে ঘিরিয়া একটি পথ থাকিবে ও উহার একপার্শ্বে গৃহাদি ও পাদপথ থাকিবে।

এই গ্রন্থের নগর-বিধান অধ্যায়ে বলা হইয়াছে যে একটি শহরে একটি হইতে বারটি বড পথ থাকিবে। নগরগুলি এমন ভাবে সংস্থাপিত হইবে যেন বিদেশের সহিত ব্যবসা-বাণিজ্য পরিচালনের অসুবিধা না হয় (১)। 'রাজবল্লভ মণ্ডনম্' নামক পুস্তকের নির্দেশ—বড় বড নগরে ১৭টি পথ পূর্ব-পশ্চিমে ও উত্তর-দক্ষিণে ধাবমান থাকিবে। অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র নগরে ১৩টি করিয়া ২৬টি পথ থাকিবে, আরও ছোট নগরগুলিতে ৯টি করিয়া ১৮টি পথ থাকিবে (২)। মানসার গ্রন্থটি বর্তমানে যে আকারে পাওয়া যায়, তাহা ১১শ শতাব্দীর পরের রচনা। মূল গ্রন্থটি সম্ভবতঃ গুপ্ত শাসনকালে অর্থাৎ গুপ্ত রাজগণের প্রথম সাতজনের রাজত্বকালে কোন সময়ে অর্থাৎ ৫০০ হইতে ৭০০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে রচিত হইয়াছে। মানসারে ময়মুনির উল্লেখ আছে, ইহা হইতে ময়মতম্-এর প্রাচীনতা স্বতঃই প্রতিপন্ন হইতেছে। মৎস্যপুরাণ, বায়ুপুরাণ প্রভৃতিও গুপ্তশাসন কালেরই প্রথম দিকে অর্থাৎ পঞ্চম শতাব্দীতে লিখিত হয়।

মৎস্যপুরাণে নগর নির্মাণ প্রসঙ্গে চারিটি আয়ত বীথি প্রস্তুত করিতে নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে (চতস্রশ্চ তথা তত্র কার্যাস্ত্বায়ত বীথয়ঃ, মৎস্য, ২১৭।১০)।

দেবীপুরাণে (৩) রাজপথ ৪০ হাত প্রশস্ত রাখার নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে যাহাতে মানুষ, অশ্ব, হস্তী ও রথ অবাধে সঞ্চরণ করিতে পারে। শাখাপথ-

---

(১) P. K. Acharyya, Ed.) Manasara, Vol III chap IX-X 1927.

(২) "মার্গাসপ্তদশৈব চাদিমে পুরে হীনং চতুর্ভিঃপুরঃ, প্রোক্তম্ কন্যসমেব মার্গনবভিঃদৈর্ঘ্যেতথা বিস্তরে। গ্রামশ্চৈব পুরার্ধতো হি তদনুগ্রামার্দ্ধতঃ খেটকম, খেটার্দ্ধেন তু কূটমেব বিবুধৈঃ প্রোক্তম্ তথা খর্বটম্" চতুর্থোধ্যায়, প্রসাদ মণ্ডনং রাজবল্লভ মণ্ডনং চ —কলিকাতা সংস্কৃত গ্রন্থমালা, ৩২।

(৩) "ধনুংষি দশ বিস্তীর্ণঃ শ্রীমান্ রাজপথ কৃতঃ
নৃবাজি রথ নাগাণামসংবাধ সুসঞ্চর।
ধনুংষি চৈব চত্বারি শাখা রথ্যাস্তু নির্মিতাঃ।
ত্রিকরাশ্চোপরথ্যাস্তু দ্বিকরাপুপরথ্যকাঃ।" (দেবী, ৭২)

গুলি ১৬ হাত, উপরথ্যা ও অল্পরথ্যা (তদন্তর্গত পথ) তিন হাত ও দুই হাত এবং জঙ্ঘা পথ চতুষ্পদ রাখিতে বলা হইয়াছে। ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে ৮০ হাত প্রশস্ত (বিংশতি ধনু) দিগ্‌মার্গ, ৮০ হাত প্রশস্ত গ্রাম মার্গ, ৪০ হাত প্রশস্ত সীমামার্গ, ৪০ হাত প্রশস্ত হস্তী, অশ্ব ও রথ প্রভৃতি অবাধ সঞ্চারযোগ্য রাজপথ ও উপপথ. ও ১৬ হাত বিস্তৃত শাখাপথ প্রস্তুত করিবার নির্দেশ আছে (ব্রহ্মাণ্ড. ৮।১০৯-১১৮)।

বায়ুপুরাণে নগর-গ্রাম নির্মাণ প্রসঙ্গে গ্রাম্য পথ, সীমাপথ, রাজপথ, ও শাখা পথের বিস্তৃতি যথাক্রমে ৮০, ৪০, ১০ ও ১৬ হস্ত পরিমিত রাখিতে বলা হইয়াছে (১)।

কামিকাগম নামক আগম শাস্ত্রে বলা হইয়াছে গ্রাম বা নগর বেষ্টন করিয়া যে পথ তাহা রাজবীথি, মঙ্গলবীথি বা রথবীথি নামে আখ্যাত ("রাজবীথি বিখ্যাতা গ্রামার্দেবহিরাবৃতা, সৈব মঙ্গল বীথি রথ বীথীতি কথিতা" ২১।২)।

ভোজ রাজ কর্তৃক একাদশ শতাব্দীর প্রথমভাগে রচিত 'সমরাঙ্গন সূত্রধার' (২) অনুসারে নগর মধ্যে রাজমার্গ উপলখণ্ড দ্বারা বাঁধান থাকা উচিত। রাজমার্গ ২৪ হাত, ২০ হাত অথবা ১৬ হাত প্রশস্ত হইবে। রাজমার্গের পার্শ্বে দুইটি করিয়া মহারথ্যা থাকিবে, এইগুলি ১২, ১০ অথবা ৪ হাত দীর্ঘ হইবে। এতদ্ব্যতীত নগরে যানমার্গ, উপরথ্যা ও ঘণ্টামার্গ থাকিবে, ঘণ্টামার্গ* রাজমার্গের ন্যায় প্রশস্ত হইবে। সবশুদ্ধ নগরে পূর্ব হইতে পশ্চিম মুখে ১৭টি ও দক্ষিণ হইতে উত্তরে ১৭টি পথ থাকিবে (পুরনিবেশঃ, ১০ম অধ্যায়, ৬-৭)।

শুক্রাচার্যের রচনা বলিয়া পরিচিত 'শুক্রনীতিসার' গ্রন্থে পথের সম্বন্ধে বিশদ আলোচনা করা হইয়াছে। শুক্রনীতিসারের প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে বিতর্কের অবকাশ আছে। পণ্ডিতদের মতে বর্তমানে প্রচলিত শুক্রনীতি দশম হইতে দ্বাদশ

(১) "বিংশদ্ধনুংষি বিস্তীর্ণো দিশাং মার্গস্তু তৈ কৃতঃ
বিংশদ্ধনুর্গ্রাম মার্গঃ সীমা মার্গো দশৈব তু।
* * *
ধনুংষি চৈব চত্বারি শাখা রথ্যাস্তু তৈঃ কৃতা।
গৃহরথ্যোপরথ্যাশ্চ দ্বিকাশ্চাপ্যুপরথ্যকা" ॥ ১২০ (বায়ু ৮)

(২) সমরাঙ্গন সূত্রধার—মহারাজাধিরাজ শ্রীভোজদেব প্রণীত (Ed. by Ganapati Shastri, Vol. I, Baroda, 1924.)

*ঘণ্টামার্গগুলি দিয়া শকট যাতায়াত করিত, শকটগুলিকে পথিকদের সতর্ক করিয়া দিবার জন্য ঘণ্টাধ্বনি করিয়া যাইতে হইত এই জন্য এই নাম হইয়াছে।

শতাব্দীর মধ্যে সঙ্কলিত হইয়াছে। ইহার কোন কোন অংশ অবশ্যই প্রাচীনতর কালে লিখিত হইয়াছিল। পঞ্চম শতাব্দীতে লিখিত বৃহৎ সংহিতায় শুক্রকে পূর্বাচার্য বলিয়া স্বীকার করা হইয়াছে। শুক্রনীতিতে লিখিত আছে যে রাজ-প্রাসাদ হইতে রাজধানীর পথগুলি চতুর্দিকে ব্যাপ্ত থাকিবে (১)। উত্তমরাজমার্গ ৩০ হাত, মধ্যম ২০ হাত ও অধম ১৫ হাত প্রশস্ত হইবে। রাজমার্গগুলি গ্রাম ও নগরের মধ্য দিয়া ধাবমান থাকিবে। এইগুলি দিয়া পণ্যদ্রব্যও বাহিত হইবে। পাদ্য (পাদপথ বা **Foot-path**) ৩ হাত, বীথি ৫ হাত ও মার্গ ১০ হাত প্রশস্ত হইবে। এইগুলি গ্রাম বা নগরের মধ্য হইতে চতুর্দ্দিকে প্রসারিত হইবে। গ্রাম ও নগরের সংখ্যা অনুযায়ী রাজা বহুসংখ্যক পথ রচনা করাইবেন। নগরে পাদ্য ও বীথি নির্মাণ করান উচিত নয় (অর্থাৎ এত অপ্রশস্ত পথ নগরের প্রয়োজন সিদ্ধ করিতে পারিবে না, সেখানে মার্গ অথবা রাজমার্গই প্রশস্ত)।

---

(১) "রাজমার্গাস্তু কর্তব্যাশ্চতুর্দিক্ষু নৃপ গৃহাৎ।
উত্তমো রাজমার্গস্তু ত্রিংশদ্ধস্তমিতোভবেৎ। ২৫৯
মধ্যমো বিংশতি করো দশপঞ্চকরোধমঃ।
পণ্য মার্গাস্তথা হ্যেতে পুরগ্রামাদিষু স্থিতাঃ ॥২৬০
করত্রয়াত্মিকা পাদ্যা বীথিঃ পঞ্চকরাত্মিকা।
মার্গোদশকরঃ প্রোক্তো গ্রামেষু নগরেষু চ ॥২৬১
প্রাক্ পশ্চাদ্ দক্ষিণোদক্ তান্ গ্রামমধ্যাৎ প্রকল্পয়েৎ।
পুরং দৃষ্ট্বা রাজমার্গান্ সুবহূন্ কল্পয়েন্নৃপঃ ॥২৬২
ন বীথিং ন চ পাদ্যাং হি রাজধান্যাং প্রকল্পয়েৎ।
ষড়্ যোজনান্তরেরণ্যে রাজমার্গন্তু চোত্তমম্ ॥২৬৩
কল্পয়েৎ মধ্যমং মধ্যে তয়োর্মধ্যে তথাধমম্।
দশহস্তাত্মকং নিত্যং গ্রামে গ্রামে নিয়োজয়েৎ ॥২৬৪
কূর্ম পৃষ্ঠা মার্গভূমিঃ কার্য্যা গ্রামৈ্যঃ সুসেতুকা।
কুর্বান্মার্গান্ পার্শ্বখাতান্নির্গমার্থাং জলস্য চ ॥২৬৫
... ...
মার্গান্ সুধাশর্করৈর্বা ঘটিতান্ প্রতিবৎসরম্ ॥২৬৭
... ...
অভিযুক্ত নিরুদ্ধৈর্বা কুর্যাৎ গ্রামাজনৈর্নৃপঃ ॥২৬৮
... ...
গ্রাম দ্বয়ান্তরে চৈব পান্থশালা প্রকল্পয়েৎ" ॥২৬৯

(প্রথমোধ্যায়ঃ, শুক্রনীতিসার—জীবানন্দ বিদ্যাসাগর ভট্টাচার্য সম্পাদিত, কলিকাতা, ১৮৮২)।

পথগুলি কূর্মপৃষ্ঠের ন্যায় মধ্যস্থলে উচ্ছ্রিত ও দুই পার্শ্বে ক্রমাবনত হইবে (যাহাতে পথে জল জমিতে না পারে)। এইগুলি (প্রয়োজনস্থলে) সেতুযুক্ত হইবে। পথের ধারে জলনিকাশের জন্য পয়ঃপ্রণালী (drains) থাকিবে। রাজা প্রতি বৎসর পথগুলি প্রস্তরচূর্ণাদি দ্বারা সংস্কৃত করাইবেন। দুইটি গ্রাম পর পর পথিকদের সুবিধার্থ পান্থশালার ব্যবস্থা রাখিতে হইবে।

শুক্রনীতিসারের দ্বিতীয় অধ্যায়ে রাজকর্মচারীদের তালিকায় স্থপতির সহিত মার্গকারের নামও উল্লিখিত হইয়াছে (ঐ, দ্বিতীয় অধ্যায়)।

শ্রীকুমার প্রণীত শিল্পরত্ন নামক আর একটি বাস্তুবিদ্যা সংক্রান্ত-পুস্তকে পথগুলিকে প্রকৃতি অনুযায়ী স্বস্তিকা, সৌম্যা প্রভৃতি বিভিন্ন আখ্যা দেওয়া হইয়াছে (১)।

প্রাচীন সংস্কৃত পুস্তকের এই সব অংশ হইতে ইহা স্বতঃই পরিস্ফুট হয় যে পথের প্রয়োজনীয়তা ও পথনির্মাণ-বিদ্যা সম্বন্ধে প্রাচীন ভারতীয়গণ সবিশেষ অবহিত ছিলেন।

(১) "প্রাগ্বীথির্দক্ষিণগা দক্ষিণ বীথি প্রতীচি মুখা,
পশ্চিম বীথ্যুত্তরগা প্রাগগ্রা চোত্তরী বীথি।৫৯
এবং চেত স্বস্তিকনাম্না শিল্পশাস্ত্রেষু কীর্ত্তিতঃ
প্রাক প্রত্যাগতয়তাত্তিস্রঃ সৌম্যাস্তি স্রোহথ বীথয়।৬০
গ্রাম পর্যন্ত বীথিস্তু খ্যাতা মঙ্গল বীথিক্য
নগরে রথ বীথি সা রথ্যাখ্যাথর্বটাদিষু।"৬১

(পঞ্চম অধ্যায়, গ্রামাদিলক্ষণং, শিল্পরত্ন—শ্রীকুমার প্রণীত, গণপতি শাস্ত্রী সম্পাদিত, টিবেণ্ড্রম, ১৯২২)।

নির্বাচিত গ্রন্থ-পঞ্জী

সংস্কৃত, পালি, প্রাকৃত, বাংলা ও অনূদিত গ্রন্থ

অঙ্গুত্তর নিকায় (সুত্তপিটক)—Pali Text Society, Vols. 1-2, London, 1885-1900.

অষ্টাধ্যায়ী (পাণিনি)—(Eng Tr.) by S C. Basu, Varanasi, 1887

অথর্ববেদ সংহিতা—শঙ্কর পাণ্ডুরঙ্গ পণ্ডিত সম্পাদিত, বোম্বাই, ১৮৯৫

আচারাঙ্গ সূত্র (ইং অনুবাদ)—Jaina Sutras—Sacred Books of the East Series, Vol. 22, Oxford, 1884.

ঐতরেয় ব্রাহ্মণম্—আনন্দাশ্রম সংস্কৃত গ্রন্থাবলী, পুনা, ১৯১৪

ঐতরেয় আরণ্যকম্—Ed. by A. B. Keith, Oxford, 1909

ঋগ্বেদ সংহিতা—Ed. by F. Maxmueller, Oxford, 6 Vols., 1849-73.

ঐ (বঙ্গানুবাদ)—রমেশচন্দ্র দত্ত কৃত, কলিকাতা, ১৮৮৫

কথাসরিৎ সাগর (ইং অনুবাদ)—By C. H. Tawney, 10 Vols London; 1915-18

কাঠক সংহিতা—শ্রীপাদ দামোদর শাস্তাবরকর সম্পাদিত, আউন্ধ, ১৯৪৩

কালিদাসের গ্রন্থাবলী (৩ খণ্ড, মূল ও অনুবাদ)—রাজেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ সম্পাদিত, বসুমতী, কলিকাতা, ১৯২৯

কৌটিলীয় অর্থশাস্ত্র (২ খণ্ড, অনুবাদ)—ডঃ রাধাগোবিন্দ বসাক, কলিকাতা, ১৯৬৪-৬৭

কৌটিলীয় অর্থশাস্ত্র (মূল)—ডঃ শ্যামাশাস্ত্রী সম্পাদিত, বাঙ্গালোর, ১৯১৫

কৌষিতকী ব্রাহ্মণম্ · Ed. by B. Linder, Jena, 1887

গোপথ ব্রাহ্মণম্—রাজেন্দ্র লাল মিত্র ও হারাণচন্দ্র বিদ্যাভূষণ সম্পাদিত (বিব্লিওথেকা ইণ্ডিকা), কলিকাতা; ১৮৭২

গৌড়রাজমালা—অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় সম্পাদিত, রাজশাহী, ১৩১৯

গৌড় লেখমালা - রমাপ্রসাদ চন্দ সম্পাদিত, „ „

জাতক (ইং অনুবাদ) ১-৬ খণ্ড—EB. Cowell & others, Cambridge, 1895-1913

তৈত্তিরীয় সংহিতা—আনন্দাশ্রম সংস্কৃত গ্রন্থাবলী, পুনা, ১৯০০

দশকুমার চরিত (দণ্ডী) মোরেশ্বর রামচন্দ্র কালে সম্পাদিত, বোম্বাই, ১৯২৫

দীঘ নিকায়—Pali Text Society, London, 1890-1911

দেবীপুরাণম্—পঞ্চানন তর্করত্ন সম্পাদিত, বঙ্গবাসী সং, কলিকাতা, ১৩০৩

ধম্মপদ অট্ঠকথা (ইং অনুবাদ) - Harvard Oriental Series, Vols. 28-30 (Pts. 1-3), Cambridge (Mass), 1921

বাঙ্গালীর ইতিহাস (আদিপর্ব)—ডঃ নীহাররঞ্জন রায়, কলিকাতা, ১৩৫৬

বায়ুপুরাণম্—পঞ্চানন তর্করত্ন সম্পাদিত, বঙ্গবাসী সং, কলিকাতা, ১৩০৭

বিনয় পিটক (Vols. 1-5)—Pali Text Society, London, 1879-'83

'বিমান বথ্ অট্ঠকথা—Pali Text Society, London, 1886

বিষ্ণুপুরাণম্—পঞ্চানন তর্করত্ন সম্পাদিত, বঙ্গবাসী সং, ১৯০৭
বৃহৎ কথামঞ্জরী—ক্ষেমেন্দ্র রচিত, কাব্যমালা সং, বোম্বাই ১৮৯১
বৃহদারণ্যক উপনিষদ্—আনন্দাশ্রম সংস্কৃত গ্রন্থাবলী. পুনা—১৯০০
বৃহন্নারদীয় পুরাণম্—পঞ্চানন তর্করত্ন সম্পাদিত, বঙ্গবাসী সং কলিকাতা, ১৩০১
ব্রহ্মাণ্ডপুরাণম্— „ „ „ „ „ ১৩১৫
বৌধায়ন ধর্ম সূত্রম্—শ্রীনিবাসাচার্য সম্পাদিত, মহীশূর, ১৯০৭
মঝ্ঝিম্ নিকায় – Pali Text Society London, 1882-1902
মৎস্যপুরাণম্—পঞ্চানন তর্করত্ন সম্পাদিত, বঙ্গবাসী সং, কলিকাতা, ১৩১৬
ময়মতম্—গণপতি শাস্ত্রী সম্পাদিত, ট্রিবেণ্ড্রম্, ১৯১৯
মহাবংশ—Pali Text Society, London, 1908
মহাভারতম্ (৪ খণ্ড)—গীতা প্রেস, গোরক্ষপুর, বিক্রমাব্দ ২০১৩-১৫
মহাভারত (অষ্টাদশপর্ব)—কালীপ্রসন্ন সিংহ অনূদিত, কলিকাতা, ১৯৪০ সংস্করণ
মহাভাষ্য-পতঞ্জলি (৩ খণ্ড) Ed. by F. Kielhorn, Bombay, 1880-85
মহাপরিনির্বাণ সূত্র (ইং অনুঃ)—Sacred Books of the East, Vol. XI, Oxford, 1881
মহাবস্তু (ইং অনুঃ) Sacred Books of the Buddhists, Vol. 16, London 1949
মানব ধর্মশাস্ত্র (ইং অনুবাদ)—Ed. by J. Jolly, London, 1887
মিলিন্দপনহ (ইং অনুবাদ)—Sacred Books of the East Series, Vol. 15
Oxford, 1890
মৈত্রায়ণীয় সংহিতা—Ed by Dr L V. Shroeder, Leipzig, 1923.
যজুর্বেদ সংহিতা—দুর্গাদাস লাহিড়ী সম্পাদিত, হাওড়া, ১৩২৬
রাজবল্লভ মণ্ডনম্—কলিকাতা সংস্কৃত গ্রন্থমালা ১৯৪৮
রাজতরঙ্গিনী (ইং অনুঃ)—M. A. Stein, Westminster, 1900
রামায়ণম্ (বাল্মিকীয়)—গীতা প্রেস, গোরক্ষপুর, বিক্রমাব্দ ২০১৭,
রামায়ণ (ঐ. বঙ্গানুবাদ)—বঙ্গবাসী সংস্করণ, কলিকাতা, ১৯০১
শঙ্কর চরিত—শরচ্চন্দ্র শাস্ত্রী, কলিকাতা, ১৯০৯
শতপথ ব্রাহ্মণম্ (ইং অনুবাদ)—Sacred Books of the east (Vols. 12, 26, 41,
43, 44), Oxford 1882-1900
শাঙ্খায়ণ শ্রৌতসূত্রম—Ed. by A, Hillebrandt, Calcutta, 1888-89
শিল্পরত্নম্—গণপতি শাস্ত্রী সম্পাদিত, ট্রিবেণ্ড্রম ১৯২২
শুক্রনীতি সার—জীবানন্দ বিদ্যাসাগর সম্পাদিত, কলিকাতা ১৮৮২
সমরাঙ্গন সূত্রধারঃ (ভোজদেব)—গণপতি শাস্ত্রী সম্পাদিত, বরোদা, ১৯২৪
সুত্তনিপাত (ইং অনুঃ)—Sacred Books of the East, Vol. X, Oxford,
1924 (2nd edn)
হরিবংশম্ (খিল)—কৃষ্ণধন বিদ্যারত্ন অনূদিত, কলিকাতা ১৮৮৩

ইংরাজী ও অন্যান্য বৈদেশিক ভাষা

Acharya, P. K.—(1) *Dictionary of Hindu Architecture*, Allahabad, 1917
(2) *Indian Architecture According to Manasara Silpa Sastra*, Allahabad, 1927

Aiyangar, S. Krishnaswami—(1) *Ancient India and South Indian History and Culture*, Vol I., Poona, 1941
(2) *The Beginnings of South Indian History*, Madras, 1918

Ali, S. M.—*The Geography of the Puranas, New Delhi*, 1966

Arokiaswami, M.—*Early History of the Vellar Basin*, Madras, 1924

Bagchi, P. C,—*India and China*, Calcutta, 1944

Bandyopadhyaya, Narayan Chandra—*Economic Life and Progress in Ancient India*, Calcutta, 1925

Banerji, G. N.—*India as known to the Ancient World*, Calcutta, 1921

Basam, A. L.—*The Wonder that was India*, London, 1954 .

Beal, S.—Si-Yu-Ki (*Buddhist Records of the Western World*) London, 1906

" *The Life of Hiuen Tsang*. London, 1914

" *Travels of Fah-Hian and Sung-un*, London, 1869

Beglar, J. D.—*Archaeological Survey of India Report*, Vols. 7. 8 and 13 Calcutta, 1873-87

Burrard, S. G. and Hayden H. H—*A sketch of the Geography and Geology of the Himalayan Mountains and Tibet*—Calcutta, 1907-8

Bhandarkar, D. R.—*Asoka*, Calcutta, 1925

Chakladar, H C.—*Geography of Kalidasa*. Calcutta, 1963

Cunningham, A,—*The Ancient Geography of India*, London, 1871

Das, S. R.—*An approach to Indian Archæology* (Vol. I) Calcutta, 1972

Das Gupta, P. C. (Ed.)—*Exploring Bengal's Past*, Calcutta, 1966

Dey, N. L.—*The Geographical Dictionary of Ancient and Mediaeval India*. London, 1927

Dowson, J (Ed)—*Elliot's History of India*, London, 1867-77

Dutta, B. B.—*Village and Town Planning in ancient India*. Calcutta, 1925

Dutta, R. C,—*A History of Civilization in ancient India*, London, 1889

Gopalachari, K,—*Early History of the Andhra Country*, Madras, 1941

Ghosh, A.—(1) *Fifty years of Archaeological Survey of India*, (Ancient India, no. 9) 1953
(2) *Archaeology in India*, *Expedition*, Vol., IV, no : 3, 1964

Giles, H.A.—*The Travels of Fa-Hsien or record of Buddhist Kingdoms*, London, 1923.

Havell, E. B.—*The History of Aryan Rule in India*, London, 1918
Hedin, Seven—*Trans Himalayan Discoveries and Adventures in Tibet* (3 Vols.), London, 1913
Jayaswal, K. P.—*History of India* (AD 150 to AD 350)—Lahore, 1933.
Keith, A. B.—*Classical Sanskrit Literature*, Edinburgh, 1923
Law, B. C.—*India as described in the early texts of Buddhism and Jainism*, London, 1941
Geography of early Buddhism, London, 1932
Ujjaini in Ancient India, Gwalior, 1944
Mackay, Ernest—*Indus Valley Civilization*, London, 1935
Majumdar, R. C.—*History and Culture of the Indian People* (Ed) Vols. I-IV (Bharatiya Vidya Bhavan), Bombay, 1950-55 ;
History of Bengal, Vol I, Dacca, 1943 ;
History of Ancient Bengal, Calcutta, 1972
Ancient Indian Colonies in the far east (Vol. 2—Champa) Lahore, 1927-44
Majumdar, R. C. and Altekar, A. S.—*The Vakataka Gupta Age*, Varanasi, 1946
Mazumdar, N. G.—*Inscriptions of Bengal*, Vol. III, Rajshahi, 1928 ;
Explorations in Sind (Memoir no. 48, A. S. I.) Delhi, 1934
Malalasekera, G. P.—*Dictionary of Pali Proper Names* (2 Vols,) London, 1937-'38.
Masson Oursel and others—*Ancient India and Indian Civilization*, London, 1934
McCrindle, J. W.—*Ancient India as described by Megasthanes and Arrian*, Calcutta, 1877.
Ancient India as described by Ptolemy, Calcutta, 1885
Mookerji, R. K.—
Asoka, London, 1928
Gupta Empire, Bombay, 1947
Harsha, London, 1926
Ancient India, Allahabad, 1956
Fundamental Unity of India, London, 1914
Chandra Gupta Maurya and his times, Madras, 1943
Hindu Civilization. (2 pts.), Bhaban's Edn. Bombay, 1957
Moti Chandra—*Geographical and Economic Studies from the Mahabharata*, Lucknow, 1945
Munshi, K. M. and Aiyer, N. C. (Ed.)—*Indian Inheritance*, Vol. I, Bharatiya Vidya Bhaban, Bombay, 1955

Nath, R. M.—*The Background of Assamese Culture*, Shillong, 1948
Panikkar, K. M.—*A Survey of Indian History*, Bombay, 1956
Pargiter F. E.—*Ancient Indian Historical Tradition*, London, 1922
Piggot. S.—*Pre-historic India*, London, 1950
Przylusky, J.—*La Legende de l' empereur Asoka*, Paris, 1925
(The Legend of Emperor Asoka—Eng Trans. by D K. Biswas
Calcutta, 1967)
Quanungo, K. R.—*Sher Shah* Calcutta, 1921
Rapson, E. J. (Ed.)—*Ancient India*, Vol, I Cambridge History of India),
Cambridge, 1922
Rawlinson, H. G.—*Intercourse between India and the Western World*,
Cambridge, 1926
Rhys Davids, T. W.—*Buddhist India*, London, 1903
Sachaw, E. C. (Ed.—*Alberuni's India*, London, 1910
Sarkar D. C.—*Select Inscriptions* Vol. I, Calcutta, 1941 ;
Studies in the Geography of Ancient and Mediæval India,
Calcutta, 2nd edn. 1960
Sarkar, S. C.—*Some Aspects of the Early Social History of India*,
Oxford, 1928
Sarkar, J. N.—*The India of Aurangjeb*, Calcutta, 1901
Sastri, K, A. Nilkanta and others—*A Comprehensive History of India*,
Vol. II, Calcutta, 1957
Sastri, K. A. Nilkanta—*The Colas*, Madras, 1955
Schoff, W. H.—*Periplus of Erythrean Sea*, London, 1912
Sen, Benoy Chandra—*Some Historical Aspects of the Inscriptions of Bengal*, Calcutta, 1942
Stein, Mark Aurel—*On Alexander's Track to the Indus*, London, 1929
An Archæological Tour in Gedrosia, Calcutta, 1931
Takakusu—*A Record of Buddhist Religion as Practised in India and Malay Archiopelago*, London, 1896
Vaidya, C. V.—*The Mahabharata, A Criticism*, Bombay, 1905
History of Mediæval Hindu India, Poona. 1926
Watters, T. W —*On Yuan Chawang's travels in India*, London, 1904
Wells, H. G.—*A Short History of the World*, (Pelican Edn.) London, 1937
Wheeler, R. E. M.—*The Indus Civilization*, Cambridge, 1953
Ancient India (no : 3) Delhi, 1947
Early India and Pakistan, Bombay, 1959
Winternitz, M.—*A History of Indian Literature*, Vol. 1 (Eng. T.)
Calcutta, 1929

Govt. of India Publications

Ancient India (Archæological Survey of India) New Delhi, 1946-63
Archæology of India (Bureau of Education), New Delhi, 1950
Epigraphica Indica. Vol. 2 and 15, Delhi (1893, 1921)
Gazetteer of the Bombay Presidency, Vol. XVI (Ed. by Sir John Campbell)
Indian Archæology (A Review) New Delhi, 1958-59
India—A reference annual, New Delhi, 1971-76,
Our Roads—(Modern India Series II), New Delhi, 1948
History of Road Development in India—Central Road Research Institute, New Delhi, 1963

Periodicals

Indian Antiquary (Bombay), 1874.
Journal of the Royal Asiatic Society of Great Britain and Ireland (London), 1894
Journal of the Bihar and Orrisa Research Society, Vol I, pt. II, 1915
Journal of the Royal Asiatic Society of Bengal, Calcutta, 1850
Bulletin de l' ecole Francaise d' *Extreme Orient,* Vol. IV, 1904

ভৌগোলিক নামের সংক্ষিপ্ত নির্ঘণ্ট

(কুমারী সুস্মিতা সেনগুপ্ত কৃত)